হরপ্পা

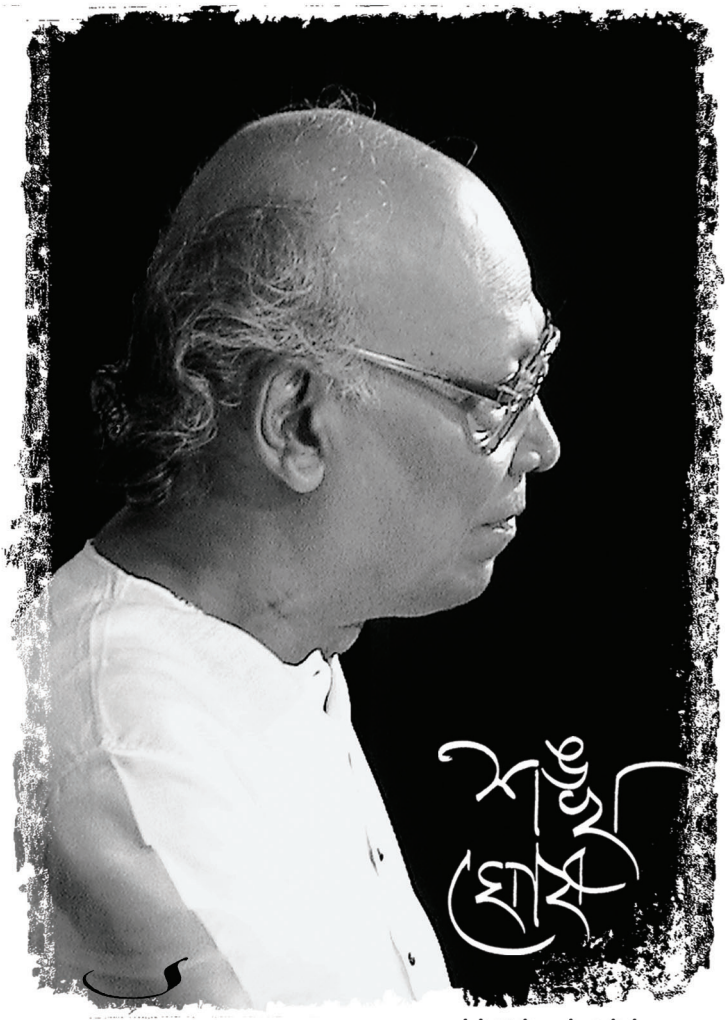

১৯৩২–২০২১

আয় আরো হাতে হাত রেখে

আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি

ছবি: দীপঙ্কর দাশ

শঙ্খ ঘোষ

১৯৩২-২০২১

করোনার আক্রমণে অন্তরীণ অবস্থায়
১ বৈশাখ ১৪২৭ থেকে 'হরপ্পা'-র
বৈদ্যুতিন পুস্তিকা প্রকাশের সূচনা।
এই ক্রমে ৫ অগস্ট ২০২১
প্রকাশিত হল 'হরপ্পা'-র শ্রদ্ধার্ঘ্য

শঙ্খ ঘোষ

প্রচ্ছদ, ক্যালিগ্রাফি ও শিল্পনির্দেশনা

সোমনাথ ঘোষ

বিশেষ সহায়তা

সৌম্যদীপ

কৃতজ্ঞতা

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত ঘোষ, শ্রাবন্তী ভৌমিক, সেমন্তী ঘোষ,
নাহাস খলিল, অশেষ ইকবাল, রেজাউল করিম সুমন, দীপঙ্কর দাশ

সম্পাদক

সৈকত মুখার্জি

http://harappa.co.in/
harappamagazine@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/harappalikhanchitran/

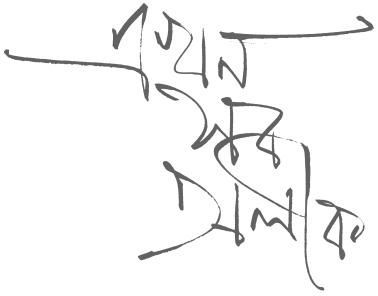

এই পৃথিবী না থাকলে থাকত শুধু অন্ধকার। কিছুই থাকত না এই সৌরলোক না থাকলে। কিন্তু কোথায় থাকত সেই না-থাকা, কোন্ পাত্রে?

(ভাষা)

করোনার গ্রাসে ধীরে ধীরে খালি হয়ে চলা প্রবীণ বুধগোষ্ঠীর কথা ভাবলেই চমকে উঠি। মনে পড়ে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় না-থাকলে বেড়ে-ওঠার কালে কী করে পড়তাম অত অনুবাদ গল্প কিংবা ক্রিকেটের ইতিহাস। প্রণবকুমারের অনুপস্থিতিতে মজারুর আনন্দ কেই-বা দিত 'আনন্দমেলা'র পাতায়। সদর-মফস্সলের রস-অ্যাখ্যানই হোক অথবা গূঢ় গৌণজীবনের আলোআঁধারী কথা, কী করে জানতাম সুধীর বাউলের সরস কলম ভিন্ন। ইহজাগতিক জীবনের নিরাড়ম্বর ধর্মনিরপেক্ষতার শিক্ষাই-বা কোথায় পেতাম আনিসুজ্জামানের লেখনী ছাড়া।

এঁদের মতো আরও অনেকের অনুপস্থিতি ব্যথিত করে। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘায়িত হয় সে-তালিকা। ২১ এপ্রিল ২০২১ ইন্দ্রপতন ঘটল আবার—না-ফেরার দেশে যাত্রা করলেন কবি শঙ্খ ঘোষ। আর কেউ তাঁর মতো করে বলবে না:

কড়িকাঠ থেকে বুকের রক্ত পর্যন্ত ঝুলে-পড়া মাকড়সা
অনেকদিন পরে ঢুকতে গেলে ডাল জড়িয়ে ধরে মাথায়,
বলে—এসো এসো, এই তো কত গ্রীষ্ম বর্ষা
কত শীত হেমন্ত বসে আছি তোমার প্রতীক্ষায়, এসো—
ব'লে ভিজে অন্ধকারে মনোহীনতার গন্ধে টেনে নিতে-নিতে
শুষে নেয় আমার সমস্ত উদ্ভিদ, আমার অন্তরাত্মা।

(প্রতীক্ষা)

তাঁর প্রতীক্ষা হয়তো শেষ। আমাদের অভিভাবকহীন প্রহর গোনা শুরু।

ছবি: দীপঙ্কর দাশ

শঙ্খ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য ৭
শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়

For **Sankho-da** ৪৯
Kumar Shahani

আরোগ্যপথের ইশারা ৬৩
ভবেশ দাশ

The Poem on the Dome and a Poet ৯১
Vivan Sundaram

কোন দেশেতে টান ... ১০১
রুশতী সেন

শঙ্খদা— জীবনের চির অম্লান পাথেয় ১১৯
অভীককুমার দে

শঙ্খ ঘোষ মৃদুস্বর, মৃদুভাষা... ১৩৭
মুজিবর রহমান

দুই কবি দুটি কবিতা ১৪৮
শামসুর রহমান ও শঙ্খ ঘোষ

শঙ্খবার ১৫৫
জান্নাতুল মাওয়া

শঙ্খ ঘোষ ১৬৫
নাহাস খলিল

'সন্ধ্যানদীর জলে' নিয়ে ... ১৭৯
পিয়াস মজিদ

চিঠিপত্র ১৯১
ভূঁইয়া ইকবাল

ছবি: সোমনাথ ঘোষ

শি বা জী ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

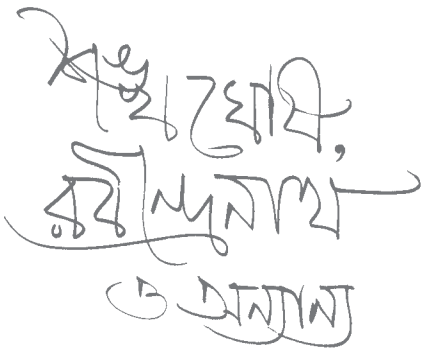

১

১৯৮০। আমি তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের উত্তর-স্নাতক পর্যায়ের ছাত্র। ভর্তির মাস কয়েকের মধ্যেই শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ হয় উচ্চশিক্ষার চত্বরে সদ্যাগত এ শাবকের। যাদবপুরের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনার সুবাদে আসতে-যেতে বহুবার দেখলেও তাঁকে, সে-পর্যন্ত বাক্য-বিনিময়ের সুযোগ মেলেনি আমার। আবিষ্কার করি, প্রত্যাশার বার অথচ লক্ষ্যভেদে অচুক শব্দচয়ন, সড়ক-বাস-লোকমুখ

থেকে কুড়িয়ে, গুছিয়ে-নেওয়া বুলির ঝলক, পরিমিতিবোধ, মেধার আবেগ, ইত্যাদি গুণলক্ষণের সমাহারে কবি শঙ্খ ঘোষের যে ভাববিগ্রহ গড়ে উঠেছিল আমার চিদ্‌কোণে, তা মানুষ শঙ্খ ঘোষের বেলাতেও সমান প্রযোজ্য।

কলেজ-জীবনে হাসিআমোদের ঊষর খরায় তেতে-পুড়ে বুদ্ধদেব বসু প্রতিষ্ঠিত তুলনামূলকে ঢুকে সদ্য পেয়েছি আমি রসসিক্ত শ্যামলিমার খোঁজ। আছেন তথায়: নরেশ গুহ, অমিয় দেব, সুবীর রায়চৌধুরী, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ফাদার আঁতোয়ান, দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, শুদ্ধশীল বসু, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, নবনীতা দেবসেন; প্রত্যেকেই রগুড়ে, অনাবিল গুলতানি, নির্বিষ ঠেস-তামাশার ওস্তাদ। এবাদে, পাশেই রয়েছেন অর্থনীতির সৌরীন ভট্টাচার্য, ইংরেজির যশোধরা বাগ্‌চী, মালিনী ভট্টাচার্য, সজ্‌নী কৃপালিনী মুখার্জি, বাংলার চিত্তরঞ্জন ঘোষ, মুদ্রণ-প্রযুক্তির অশোক মুখোপাধ্যায়—ফাজিল বটকেরায় এঁরাও কেউ কম যান না। মৃদুবাক্ শঙ্খ ঘোষের সাহচর্যে আরোই রম্য-রঙিন আমার ভাষা-পরিবেশ।

অবস্থা এমন, যেন, রঙ্গশব্দের অনর্গল ধারাপাতে কেবলই গুনগুনোচ্ছি আমি, শঙ্খিল সেই 'বৃষ্টি'-স্তোত্র:

আমার দুঃখের দিন তথাগত
আমার সুখের দিন ভাসমান!

২

শঙ্খ ঘোষ, চলমান রবীন্দ্র-কোষ—রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে গভীর অধীত বিদ্যার পাশাপাশি ছিল তাঁর রবীন্দ্র-রচনা ও জীবন ঘিরে

সূক্ষ্ম-তুচ্ছ নানান খুঁটিনাটির ওপর বিস্তৃত দখল। কস্মিনকালেও, তাঁরই অনেক সমসাময়িক লিখিয়ের মতো, নিষ্কারণ নিষ্করুণ রবীন্দ্র-দূষণে উদ্‌ভ্রান্ত হননি তিনি। অপরপিঠে, গদগদে রবীন্দ্র-ভজনে ছলছলে, নির্বিচার তর্পণে বিহ্বল হওয়ারও পাত্র ছিলেন না। অবাক ব্যাপারই একরকম, রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আমরণ ব্যাপৃত, তৎসত্ত্বেও, শঙ্খ ঘোষের কবিতায় আদৌ নেই মাছিমারা রাবীন্দ্রিক মুদ্রাছাপ। তলে-তলে বহমান রৈবিক বোঝাপড়া, সমনন ঠোকাঠুকি বই এ কামাল অসাধ্য।

১৯৪১ সনে, রবীন্দ্র-প্রয়াণের অব্যবহিত পরেই, ছাপা হয় জীবনানন্দ দাশের 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা কবিতা'। নির্যাস সে প্রবন্ধের: ইতিহাসের বাঁকে-বাঁকে রবীন্দ্র-মোহনায় ফিরে-ফিরে আসা বাংলা-সাহিত্যিকদের অনিবার্য ভবিতব্য। অনিস্তার সেই দায়নির্বাহে অপরাঙ্মুখ শঙ্খ ঘোষ, রবীন্দ্র-পরিক্রমায় অক্লান্ত; আর হয়তো, জীবনানন্দীয় সূত্র মোতাবেক, জীবনানন্দের মতোই, সে-কারণেই সফল তিনি নিজ স্বরভঙ্গি অন্বেষণে, স্বায়ত্তঅর্জনে।

৩

বিশ শতকের আটের দশক, শেষের দিক। আমি তখন তুলনামূলকে পড়াই। একদিন, ক্লাশঘরেই, সুবীর রায়চৌধুরীর কাছ থেকে পাই জরুরি তলব, আমাকে না-কি সব কাজ ফেলে অবিলম্বে যেতে হবে তাঁর বিভাগীয় কক্ষে, অবস্থা গুরুচরণ। গিয়ে দেখি, এক ফালি কাগজ পানে হতভম্বত চেয়ে উনি। পর্চায়, ওঁরই হস্তাক্ষরে খচিত, রবীন্দ্রনাথের কোনো এক ইংরেজি কবিতার চূর্ণ দুই পঙ্‌ক্তি। এরপরের কথোপকথন:

সুবীরবাবু। এদের বাংলাটা জানা আছে তোমার?

আমি (নম্রত)। আজ্ঞে না। একে রবি-তর্জমায় মূলমাত্রে ছায়া-ছায়ময়-

সুবীরবাবু (রাগত)। রয়েছে কোন্ কবিতায়?

আমি (পূর্ববৎ)। তায় রবীন্দ্রকাব্য মহাসমুদ্র ন্যায়-

সুবীরবাবু (হতাশ)। তাহলে, বলতে পারবে না তুমি?

আমি (নতমস্তক)। আমি তো তেমন ডুবুরি নই যে-

অতঃকিম? অধ্যাপকীয় যা দস্তুর, বসে গোলবৈঠক। সর্বসম্মতি-ক্রমে স্থির হয়, উপায় নেই, শঙ্খ ঘোষের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গতি নেই। সুবীর রায়চৌধুরীর তরফ থেকে দূতিয়ালির ভারপ্রাপ্ত হন সৌরীন ভট্টাচার্য। এদিকে, সৌরীনবাবু স্বভাব-ফচকে, আলগা মশকরায় বিশেষ তালেবর। পর্চাখানি শঙ্খবাবুর হাতে তুলে দেওয়ার মুহূর্তে আলতো-সে হুল ফোটান দূত মহোদয়: "সুবীর বলছিল, আপনার দ্বারা কি এদের মূলোদ্ধার সম্ভব হবে?"। বাক্যশরটি কানে গেছে কি না গেছে, পাঞ্জাবির পকেট থেকে তুরন্তবেগে ঝর্ণাকলম বের ক'রে ফসফসিয়ে লিখে দেন শঙ্খ ঘোষ,

আমাদের ওই এড়িয়ে-যাওয়া একজোড়া বাংলা চরণ। লিখে, সৌরীন-খোঁচার জ্বালাতেই নিশ্চয়, বলেন শঙ্খবাবু, "আশা করি, এ দু-কলি কোন্ কবিতার তা সুবীর নিজেই সহজে খুঁজে পাবে"।

উফ! সেই অথৈ জল! হাবুডাবু খাই আমরা। আঁতে যা একখান রক্তক্ষয়ী আঘাত হেনেছেন শঙ্খবাবু, লজ্জার মাথা খেয়ে পুনর্বার তাঁর দ্বারস্থ হওয়ার রাস্তাও রুদ্ধ। সংকুল এ পরিস্থিতিতে বিপত্তারিণী রূপে আবির্ভূত হন মালিনী ভট্টাচার্য। সন্দেহ ওঁর, ইংরেজি ছত্রদুটির ছিরি যা, তাতেই আছে ইংগিত, ওগুলি রবীন্দ্রনাথের কলম-নবিসি অধ্যায়ের অংশ। বলেন আমাকে: "চলো, রবীন্দ্র-রচনাবলীর একেবারে গোড়ার খণ্ড থেকে ওলটাই পাতা"। মালিনীদি সে-সময় যাদবপুরেই, শিক্ষক-আবাসের বাসিন্দা। সেখানে গিয়ে আমরা দুজনে নামি তদন্তে। ভাগ্য প্রসন্ন, নির্ভুল মালিনীদির অনুমান, মিনিট পনেরোয় বেরিয়ে পড়ে অস্পষ্ট, অবোধ্য ইংরেজির উৎস, রবীন্দ্রনাথের কৈশোরক পর্বের আদি বাংলা কবিতাখানি। শুভ এ পরিণতিতেই সমাপিত সুবীরবাবু ও শঙ্খবাবুর মধ্যে ঘনায়মান অবনিবনা। এমনতরো আকচাআকচি কতবার যে অন্তিমের কিনার ঘেঁষেও মিটমাটের তটে ভিড়ল, ইয়ত্তা নেই তার। শঙ্খ ঘোষকে, নেহাৎ কৌতুক-ছলে কিন্তু আবডালে, 'শ্মশ্রুবিহীন রবীন্দ্রনাথ' খেতাবে ভূষিত করতেন মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। একবার হল কী, দুঃসাহসের বাহুল্যেই নিশ্চিত, সোজাসুজি শুধোন উনি, শঙ্খবাবুকে ওঁর কন্যাদ্বয় ইদানীং 'গুরুদেব' ব'লে ডাকছে কি-না এবং সে সম্বোধনে তিনি সস্নেহে 'কে, রথী?' ব'লে সাড়া দিচ্ছেন কি-না। ব্যস, আর যায় কোথায়। নির্দোষ ওই মজার শাস্তি ভুগতে হয়

মজারুকে—চোখের সামনে রইলেও মানববাবু, তাঁর দিকে আড়ে চেয়েও, কথা সরে না শঙ্খবাবুর মুখে। অবশ্যি, ওই আড়ি ভাঙতেও বেশি সময় লাগে না। শঙ্খ ঘোষ যে আদতে 'শিশু ভোলানাথ'...

৪

২১ এপ্রিল ২০২১, শঙ্খ ঘোষের প্রয়াণ। এর ঠিক এক হপ্তা আগে, ১ বৈশাখ ২৪২৮, ১৫ এপ্রিল ২০২১-এ প্রকাশিত তাঁর *ছেড়ে রেখেই ধরে রাখা* বইয়ের 'ভূমিকা'য় পাই, বহুবার শোনা হলেও, অপ্রত্যাশিত খবর: "'নিঃশব্দের তর্জনী'র মতো সাড়ে তিন পৃষ্ঠার একটি গদ্য আর জার্নাল ধরণের কিছু লেখা ছাড়া একটিও-কোনো গদ্য স্বেচ্ছায় বা সানন্দে লিখতে পারিনি কখনো"।

আশ্চর্য! এখনও অব্দি এগারো খণ্ডে গ্রথিত শঙ্খ ঘোষের *গদ্যসংগ্রহ*-এ কেবল রবীন্দ্রনাথ বিষয়েই আছে আগোটা পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড এবং সপ্তম খণ্ডের বৃহদাংশ; এদের বাইরে অন্যান্য খণ্ডেও ফিরে-ফিরে এসেছে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ। আশ্চর্য! *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক* (১৯৬৯), *ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ* (১৯৭৩), *এ আমির আবরণ* (১৯৮০), *উর্বশীর হাসি* (১৯৮১), *নির্মাণ আর সৃষ্টি* (১৯৮২), *কবির অভিপ্রায়*-এর (১৯৯৪) মতন গ্রন্থ কিংবা *ছন্দের বারান্দা*-র (১৯৭১) বলয়ভুক্ত প্রবন্ধ 'মুক্তছন্দ ও রবীন্দ্রনাথ', 'স্বাভাবিক ছন্দ ও রবীন্দ্রনাথ' কি তবে স্বেচ্ছানির্মিত, সানন্দচিত্ত প্রণয়ন নয়? না-কি গদ্যে গরজশূন্যতার ওই একরার নিছক তৎ কবি-অহং-এর হয়ে সওয়ালের অজুহাত? কই,

রবীন্দ্রনাথে তো কাব্য ও গদ্যে, ভাব ও তত্ত্বে, হৃদয় ও মগজে সুয়োরানি-দুয়োরানি ভাগাভাগি নেই, নেই পক্ষপাতের তরবিতর। ১৩ জুলাই ১৮৯৩-এ, *ছিন্নপত্রাবলী*-র ১০৭ সংখ্যক চিঠিতে লিখেছিলেন বত্রিশ বৎসর বয়স্ক রবীন্দ্রনাথ: "আমি বাস্তবিক ভেবে পাই নে কোন্‌টা আমার আসল কাজ। এক-এক সময় মনে হয় আমি ছোটো ছোটো গল্প অনেক লিখতে পারি...আবার এক-এক সময় মনে হয়...মিল করে ছন্দ গেঁথে ছোটো ছোটো কবিতা লেখা[র] কাজই করা যাক...যখন গান তৈরি করতে আরম্ভ করি তখন মনে হয় এই কাজেই যদি লেগে থাকা যায় তা হলে তো মন্দ হয় না...আবার যখন 'বাল্যবিবাহ' কিম্বা 'শিক্ষার হেরফের' নিয়ে পড়া যায় তখন মনে হয় এই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ কাজ। কী মুশকিলেই [যে] পড়েছি!"।

১৯৬৬-এর নিবন্ধ 'নিঃশব্দের তর্জনী'। যে চতুঃসীমায় তাঁর শ্বাসবাস সে সম্বন্ধে চৌত্রিশ বছরের যুবক নিবন্ধকারের ক্ষোভ: কথা, কথা, শুধুই কথা; শূন্যগর্ভ দাম্ভিকতা, ক্লেদমুগ্ধ নির্জীবতা, অ-লিপ্ত লুব্ধতা বড়ই সুলভ একালের বড়বাজারে; সকলে অকাতরে উৎক্ষিপ্ত ব'লেই কারও মজ্জা-মধ্যে নেই গর্ব বা উপেক্ষার স্পর্ধা, ঔদাসীন্যে সরে দাঁড়াবার সামর্থ্য; আর তাই, সংবেদনশীল যে, সে যখন বাইরে থেকে ঘরে ফেরে, বাধ্যতই ভর করে তাকে দুর্বহ গ্লানি। নিবন্ধকারের জিজ্ঞাসা: এমতাবস্থায়, দুর্বিষহ এ পরিপাশে, কেমন হওয়া উচিত কবিতার গড়ন-কহন? উত্তর: প্রয়োজন, শব্দ-ভিতর হিরণ্যপ্রভ নৈঃশব্দ্যের রোপণ; বহিরঙ্গের সাজ খসলে, নিষ্কাশিত হলে

গৃহ-বাহিরের আবর্জনা, তবেই-না শমিত হয় চলন; এগোয় তখন কবিতা নিঃশব্দের তর্জনী সংকেতে, প্রগলভতার আপদ কাটিয়ে, যতির গতিতে, পুঞ্জচুপের প্রাণনায়, পায় স্বস্তিময় নিবিড় আয়তন।

শঙ্খ ঘোষের ক্ষুদ্র নিবন্ধটিতে স্বভাষার একমাত্র যে কবি "স্বচ্ছ নীরবতার পর্দা" টানার কারুশিল্পের পূর্বসাধক হিসেবে উল্লিখিত, তিনি, জীবনানন্দ। তা-ও রয়ে যায় প্রশ্ন, নিরাভরণ যে চারুতা শঙ্খ ঘোষের অন্বিষ্ট, তার ইশারা কি রবীন্দ্রনাথের নিদেন গীতাঞ্জলি পর্বের "আমার এ গান ছেড়েছে তার/সকল অলঙ্কার" (১৯১০) সম উচ্চারে ছিল না?

ফেরা যাক *ছিন্নপত্রাবলী*-র ১০৭ সংখ্যক চিঠিতে। ১৩ জুলাই ১৮৯৩-এর ওই খতে তাঁর যথাযথ কাজ নিয়ে শিরঃপীড়ার পাশাপাশি আছে 'নীরব' নয় 'সরব' কবি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দিক্‌নির্দেশ। কে সে? না, অবগত যে, "অলক্ষিত অচেতন নৈপুণ্যবলই" "কবিত্বের মূল"; মর্মে-মর্মে জানে যে, "ভাষা ভাব অনুভাব" সমস্তই তার "সৃজনক্ষমতা"র "সরঞ্জাম মাত্র"। দশদিশের "রহস্যপাথারে" "ঘুরিয়ে জাল" যা তোলে সে, নেয় নিকিয়ে-ঝিকিয়ে, সে-সমস্তের "মূল্য" "দোকানদারের" যাচাইয়ে অর্থে ফক্কা, "সমসাময়িক পাঠকমণ্ডলী"র "হাটে"ও বিকোয় না মোটে—অধরাই রয়ে যায় তাই, বলা না-বলার আবছায়ায়, সরব কবির বচনীয়তা হতে অনির্বচনীয়তা পানে অভিসারের যাত্রাচ্ছবি।

এমনতরো উপলব্ধি তো ভালোই গচ্ছিত 'নিঃশব্দের তর্জনী'তে।

৫

এখানেই খুলে-খোলসা হোক, রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বগত টুকরো-টুকরো দ্যুতিবিচ্ছুরিত অজস্র পর্যবেক্ষণের মাহাত্ম্য মেনেও, তাঁর নান্দনিক বিচারপত্রকে সামগ্রিকতায় গ্রহণ করা আমার অসাধ্য। যে প্রত্যয়জোরে *নির্মাণ আর সৃষ্টি*-র 'ভূমিকা'য় লিখেছিলেন শঙ্খ ঘোষ, "কখনোই [রবীন্দ্রনাথ] সরে আসেন না কেন্দ্রীয় তাঁর মূল শক্তির ভর থেকে", তেমন জোর আমার অনায়ত্ত। উলটে, আমার কানে "কেন্দ্রীয়", "মূল" বা "ঐক্যের ভিত্তি"র মতন মন্ত্রণাসমূহ জবরদস্তিবৎ। মোটের ওপর, বহুবিধ স্মরণীয় মন্তব্যে আকীর্ণ হলেও তা, রবীন্দ্রনন্দনবীক্ষা আমার আদপে সুবিধের ঠেকে না। রুচির দোষেই হবে, রবীন্দ্রনাথের নন্দনবিদ্যা সম্পৃক্ত তত্ত্বআঞ্জাম তথা প্রয়োগদস্তুর, মাঝেসাঝে কাঠ-কাঠ কড়া উক্তি সত্ত্বেও, গোল-গোল মিঠেবুলির সমাহার ও ক্লান্তিদায়ক পুনরুক্তির বেশি লাগে না আমার। কেউ যদি ওই পৌনঃপুনিকতাতেই "ঐক্য" প্রতিভাত হতে দেখেন, তাহলে তো মহাযন্ত্রণা, আরও বাড়ে জ্বরকম্পন।

অথচ, *নির্মাণ আর সৃষ্টি*-র 'ভূমিকা'য় যা-ই জপান শঙ্খ ঘোষ, বইটি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নান্দনিক নানান বিধানে আন্তঃঅসংগতি, রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ভরাট অসম্পূর্ণতার ইতিবৃত্ত। এই যেমন, 'আধুনিক' বিশেষণটি ঘিরে রবীন্দ্রনাথের দুর্নিবার দোলচাঞ্চল্য।

বিশ শতকের দুয়ের দশক থেকেই রবি-অন্তরে ক্রমগাঢ় হয় বিশ্বাস, কী বিলেতে কী স্বভূমে, 'সুন্দর' বস্তুটিকে বরবাদ করতেই উদ্ভূত হয়েছে আধুনিক সাহিত্য। সেই জন্যই পাঁক,

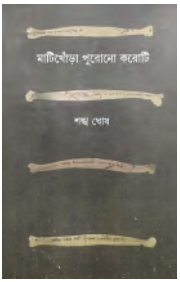

জঞ্জাল, পচাফল, পোকায়-কাটা কুসুম, পোড়োজমি ইত্যকার কুশ্রী প্রতীকের ছড়াছড়ি, যৌনকারবিকার নিয়ে বেআব্রু বাড়াবাড়ি তাতে, পেশকারিতে গাজোয়ারি কসরৎ, কালাপাহাড়ি বাহাদুরির দেখনদারি। এরপর, যখন টের পান রবীন্দ্রনাথ, কাব্যমসনদ হতে তাঁর অপসরণই বাংলার তরুণ কবিদের খাস মতলব, তার মোকাবিলায় কোমর বেঁধে আসরে নামেন তিনি। চাকচিক্যের চতুরালিতে কোনো জোয়ানের চেয়ে কম যায় না বুড়ো, তার জানান দিতেই যেন, আটষট্টি বছর বয়সে লেখেন নয়া কিসিমের উপন্যাস, *শেষের কবিতা* (১৯২৯)।

শেষের কবিতা-র নটপ্রধান অক্সফোর্ড-ফেরত অমিত রায়—তার ইংরেজ বন্ধু ও বন্ধুনিদের মুখে অমিট রায়ে—অমিতপ্রগলভতার জ্যোতিষ্কবিশেষ। "অক্সফোর্ডের রঙে পাকা" যুবকের ঝাঁ-চকচকে বুকনি কান ধাঁধায়, ঝকমকে বোলবাজের রশ্মিরাশি মিইয়ে ছাড়ে অন্যদের। যুগান্তরের বার্তাবহ অমিত, রবীন্দ্র ঠাকুরের বিরুদ্ধে সবুজের অভিযানের ডঙ্কাবাদক। তবে, মজার কাণ্ড, পাণ্ডুলিপিতেই মজুত সাক্ষ্য, "বালিগঞ্জের সাহিত্যসভা"য় উত্থাপিত অমিতের যে দ্রোহঘোষে *শেষের কবিতা*-র

সূত্রপাত, সেটি, ২৫ জুন ১৯২৮, উপন্যাস-রচনের সমাপ্তি-উত্তর পরবর্তী সংযোজন ('শেষের কবিতা', *গ্রন্থপরিচয়*, পশ্চিমবঙ্গ সরকার: ২৫ বৈশাখ ১৪০৮, পৃ ৯০০)। এর মানে, কেতকী ওরফে "বিলিতি কৌলীন্যের ঝাঁঝালো এসেন্স্"-বিশিষ্ট কেটি মিটার, অমিত ও লাবণ্যকে নিয়ে রোমান্সের মনস্তাত্ত্বিক ছানবিন সাঙ্গ ক'রে, পরে, রবীন্দ্রোত্তর বা রবীন্দ্র-ধুত্তোর কাব্যাদর্শের ইস্তেহারটি জোড়েন রবীন্দ্রনাথ—যেন-বা, স্বদেশি বিদ্রোহীদের হাওয়ায় ফাঁসাতে পাল, তাদেরই মুখপাত্র সাজবেশ চড়াবার ফন্দিটি after-thought, পশ্চাৎচিন্তন।

তবে, খুব শীঘ্রই ওই পশ্চাৎচিন্তনই রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু রচনায় পুরোভাগ জুড়ে বসে। জীর্ণ পুরাতনের নাছোড় পোষকতায় অবান্তরের সীমানায় উপনীত তাঁর সাহিত্যবিবেক, নবীনদের তরফে এ অপবাদে রুষ্ট, শঙ্কিতও বটে, প্রচেষ্টিত হন রবীন্দ্রনাথ স্বআধুনিকীকরণে। যে কৃত্রিমতা সম্পর্কে অভিযোগের অবধি ছিল না তাঁর, নিজেকে মেজেঘষে যুগোচিত করার তাড়নায় তাতেই অনবরত জড়ান উনি, কাটাতে ব্যর্থ হন শিং ভেঙে বাছুরের দলে ভেড়ার ফাঁড়া—*নির্মাণ আর সৃষ্টি*-র অন্যতম উপপাদ্য এটি। বুড়োহাড়ের ভেলকি দেখাতে, আধুনিকের ভিয়েনে মুচমুচে খই ফোটাতে, যা-সব অখাদ্য উপহার দেন রবীন্দ্রনাথ, সে-তালিকায় নিশ্চয় আছে *নবীন* গীতিনাটিকা (১৯৩১), অনেকানেক গদ্যকবিতা, (আমার মতে) *চার অধ্যায়* (১৯৩৪) উপন্যাসে স্বদেশি আন্দোলনের মন্ত্রগুরু বাগ্মীপ্রবর ইন্দ্রনাথের বচনরাজি, *তিন সঙ্গী* (১৯৪১) গল্পত্রয়ী, এবং অতি অবশ্যই *বাঁশরি* (১৯৩৪) নাটক। অশেষ সান্ত্বনা,

‘ললাটের লিখন’/‘ভালোবাসার নিলাম’/‘পুনরুদ্ধার’ নামধেয় যে গল্পখানিতে ছিল বাঁশরি-র বীজ, সেটি “ভদ্রসমাজে” অচল বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই তার মুদ্রণ অঙ্কুরেই “ধ্বংস” ক’রে দেন (‘বাঁশরি’, *গ্রন্থপরিচয়*, পৃ ৭৮৭)। বাস্তবিক, সমকালীন বেয়াড়া যুবাদের একহাত নিতে ফাঁদা, চকমকে চুমকিতে ঠাসা, *বাঁশরি* ন্যায় অপাঠ্য, অশ্রাব্য, অসহ্য নাটক বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ।

অত কীর্তি, অত যশখ্যাতি, আত্মপ্রসাদী অত সিদ্ধি, তা-ও, আর-দশ রক্তমাংসের মানুষের মতো রবীন্দ্রনাথও insecure, অসাব্যস্ত, অব্যবস্থিত। বিরাট তফাৎ তবু, অধিকাংশ যেখানে সেরেফ ভেতরগোঁজা, রবীন্দ্রনাথের টলমলায়মান সত্তা ভাঙাগড়ার লীলায় নিত্যলিপ্ত। কখনো-সখনো গেলেও ঠেকে, অন্তর্ঘাতের মুনসিয়ানায় অজেয় তিনি—অ-তৃপ্তির ইন্ধনে পারেন গাইতে, “শান্তি কোথায় মোর তরে হায় বিশ্বভুবন-মাঝে,/অশান্তি যে আঘাত করে তাই তো বীণা বাজে” (১৯১৮)। ওই “কান্নাহাসির-দোল-দোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা”য়, একবার যদি (তাঁরই মনগড়া) আধুনিক বাচনভঙ্গি আত্তীকরণের নাছোড় রোখে দিগ্‌ভ্রান্ত হন, উদীয়মান কলাশৈলীর বোঝাপড়ায় আড়বুঝোমির চরম ক’রে ছাড়েন, তবে, অন্যত্র, এমন সমস্ত অত্যাশ্চর্য অভাবিত কাণ্ড ঘটান যাদের আগাম-আভাস *গীতাঞ্জলি* পর্ব কেন, *বলাকা* (১৯১৬) কিংবা *পূরবী*-তেও (১৯২৫) নেই।

এই যেমন, ১৯৩১-এ হঠাৎ-উদগীর্ণ ‘শিশুতীর্থ’ (*পুনশ্চ*, ১৯৩২)—টানা গদ্যের দীর্ঘ এ কবিতায় থেকে-থেকেই ঝিকিয়ে ওঠে ভয়াবহ চলৎছবি। কিন্তু, “পাহাড়তলিতে অন্ধকার মৃত

রাক্ষসের চক্ষুকোটরের মতো", "নিশীথরাত্রের ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ", "লুপ্ত নদীর বিস্মৃতিবিলগ্ন জীর্ণ সেতু", "বিভীষিকার উল্কি", "অগ্নিগিরিনিঃসৃত গদগদকলমুখর পঙ্কস্রোত", "রাত কত হল? /উত্তর মেলে না" ইত্যাদি অমঙ্গলবাচক যত তুলনা, প্রতিমা বা বর্ণনা 'শিশুতীর্থ'-এ আছে, সে-সবের একটিকেও সাজানো-বানানো, ভুয়ো-আধুনিক লাগে না। বরং, কবিতাটি যেন বিভিন্ন শটের মন্তাজপ্রবাহ, সপ্রস্তুত চিত্রনাট্য। নির্বিবাদ, এ-কারণেই ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত *সুবর্ণরেখা* (১৯৬২; মুক্তি: ১৯৬৫) ছবির পশ্চাৎপট 'শিশুতীর্থ', তাতে পর্দায় বারেবার সরাসরি অক্ষরমালায় উৎকলিত কবিতাটির এ-লাইন সে-লাইন।

অনর্থক তর্কের ঘোলা আবর্তে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেমাঝে স্খলন ঘটলেও, নিয়ত নব উন্মেষে দীপ্ত তাঁর শেষের দশক। ওই পর্যায়ের ক-টি নিদর্শ: *প্রান্তিক* (১৯৩৭) এবং তাঁর অন্তিম কাব্যচতুষ্ক *রোগশয্যায়* (১৯৪০), *আরোগ্য* (১৯৪১), *জন্মদিনে* (১৯৪১), *শেষ লেখা* (মরণোত্তর: ১৯৪১); এদেরই পাশাপাশি আছে উদ্ভটরসের বইজোড়া *সে* (১৯৩৭) ও *গল্পসল্প* (১৯৪১), ভাষানির্মেদের দৃষ্টান্তস্থল *ছেলেবেলা* (১৯৪০) এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সংকট-বৃত্তান্তে ভরা *ছড়া* (মরণোত্তর: ১৯৪১); 'শিশুতীর্থ'-এ "উত্তর মেলে না" আক্ষেপ যদি-বা মোচনের তীর্থতীরে পৌঁছেছিল, *শেষ লেখা*-র ত্রয়োদশ কবিতায় সে সম্ভাবনা পুরোই অবসিত, "কে তুমি।/পেল না উত্তর"; পূর্ণেন্দুবিকাশ সরকার সংকলিত *গীতবিতান তথ্যভাণ্ডার* (২০১৯) সূচিমালা হতে জ্ঞাত হই, ৭০ থেকে ৮০ বছর বয়স

পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর মোট গানের প্রায় ২০% রচেন—কী বাণীমঞ্জুষায়, কী সুরসৌকর্যে, দস্তুরমতো অভূতপূর্ব এরা; আরও অবাক-করা ব্যাপার, *শেষের কবিতা* সমাপ্তিবর্ষ ১৯২৮-তেই আচমকা শুরুয়াত হয় রবীন্দ্রনাথের নূতন ধরণের এক রূপসন্ধান—যেন, অবচেতনের অনুরোধে, অবরুদ্ধ বাসনার চাপে, কোন্ আগ্নেয় গহ্বর হতে উত্তপ্ত লাভা ন্যায় বেরিয়ে আসে রঙে-রেখায় প্রোজ্জ্বল, কমবেশি আড়াই হাজার বিচিত্র চিত্র।

অতএব, বিস্ময়ের কী, যে *নির্মাণ আর সৃষ্টি*-র অনেকখানি জুড়ে 'আধুনিক' বা 'আধুনিকবাদ' সংক্রান্ত রবীন্দ্র-বিশ্লেষণ, 'আধুনিক' বস্তুটিকে সাততাড়াতাড়ি আত্মস্থ করতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনার বিতীর্ণ খতিয়ান, তাতেই আছে তাঁর নিজস্ব আধুনিকতা উৎসর্জনের আন্তরিক স্বীকৃতি। শঙ্খ ঘোষের জবানিতে যখন শুনি, "জীবনের শেষ পনেরো বছরে আমাদের এই কবি পৌঁছবেন এক নজিরবিহীন সৃষ্টিতৎপরতায়, গল্প কবিতা নাটক গানের চেনা জগতে অচেনা সব ঝুঁকি তৈরি করবেন তিনি, ভেঙে দেবেন আত্মনিরাপত্তার সমস্ত বেষ্টন...ভিন্নরকমের এক আধুনিকতা নিয়ে তিনি বেঁচে থাকেন আমাদের সামনে", তখন, রবীন্দ্র-সত্তায় আমরণ কোনো "কেন্দ্রীয়", "মূল" বা "ঐক্যের ভিত্তি" সংরক্ষিত ছিল কি-না, স্থিরসংকল্পের সে ভাবনা আপনা হতেই কেমন জানি ঝাপসা-নাকচ হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথের সাথে শঙ্খ ঘোষের লুকোচুরি খেলা, দ্বন্দ্বমিতালির অনুপম দৃষ্টান্ত, *ছন্দের বারান্দা*-র 'মুক্তছন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ'। নিবন্ধটি রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ ১৯৬১-তে প্রণীত।

বাংলা ছন্দালোচনায় শঙ্খ ঘোষের বিশিষ্ট অবদান 'বারান্দা'-র রূপকল্প। এরই সাযুজ্যে আকার পায় 'ঘর' বা 'অন্দর' ও 'বাহির' বা 'সদর'-এর উপমা। 'অন্দর' যদি পূর্ণপর্বে-পর্বে সমমাত্রিক, নিয়মিত পদক্ষেপে বাঁধা কবিতার ঘাঁটি হয়, 'সদর' তাহলে বেড়িভাঙা অবাধ বিচরণের ক্ষেত্র, অসমসাহসিকতায় তালভাগে অনিয়মিত কবিতার চারণভূমি। 'বারান্দা' তবে 'ঘর' থেকে 'বাহির' এবং 'বাহির' থেকে 'ঘর'-এ যাতায়াতের সংলগ্নস্থল, আঙিনা—চলাফেরা তথায় এই নিয়মিত তো ওই অনিয়মিত, বলা যাক, বেনিয়মিত। প্রকারভেদে অন্দরমহল আন্দোলিত তিন ছন্দে: 'মিশ্রকলাবৃত্ত', 'দলবৃত্ত', 'কলাবৃত্ত'। অপরদিকে, 'সদর'-এ নেই তালামারা কড়াকড়ি; আছে বরং সেখানে, নীল আকাশের নিচে যত্রতত্র বিহারের স্বাধীনতা—আদ্যোপান্ত আবাঁধা হয়েও ছন্দস্পন্দিত যা, তারই পারিভাষিক আখ্যা, 'গদ্যকবিতা'।

বাংলা কাব্যদুনিয়ায় প্রাগাধুনিক তথা আধুনিক আমলে ঘরোয়া ছন্দ মধ্যে চতুর্মাত্রিক মিশ্রকলাবৃত্ত প্রাধান্যে নিরঙ্কুশ—অন্দরদেশে ওতেই ঘনতম যানজট।

এল ১৮৬১, বেরোল, মাইকেল মধুসূদন দত্ত-এর *মেঘনাদবধকাব্য*। সাধিত হল মস্ত বিপ্লব: ঘুচল, আগের জমানার মিশ্রকলাবৃত্তে প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিঅন্তে যন্ত্রবৎ দাঁড়ি টানার একঘেয়েমি; ছত্রপিছু বহুযুগযাপিত ৮+৬=১৪ দ্বিপদী পয়ারের ছাঁদ বাঁচিয়েও, থমকে থেমে এগোবার বাধা ঠেলে, ছত্র হতে ছত্র উজিয়ে, প্রবহমাণতার গতিস্পর্ধায় মিললে সঙ্গমে, পঙ্‌ক্তিযতি ও ভাবযতি; তদবধি, নেই তায় অন্ত্যমিল—অমিত্রাক্ষর/অমিতাক্ষরে লুপ্ত, লাইন-পিছু সমধ্বনি পূরণ।

মেঘনাদবধকাব্য-এর অভিঘাতে পরবর্তী বেশ কিছু কবি নামলেন স্বতোশ্চল মিশ্রকলাবৃত্ত নিয়ে নানাবিধ নিরীক্ষায়—অনতিবিলম্বেই মিশে একাকার তা বাংলা কাব্যকলার অস্থিমজ্জায়।

অতঃপর উদয় রবীন্দ্রনাথের—*মেঘনাদবধকাব্য*-এর ছাপিত সন, ১৮৬১-তে জন্ম যাঁর। মাইকেলি প্রবহমাণতায় নিহিত মূলসূত্রটি খোলসা অবশেষে তাঁর ১৯১৪-১৫-র কবিতাপত্রে, গ্রন্থিত যা *বলাকা*-য় (১৯১৬)। পাঠকের চোখে খেলে যায় ছন্দবিদ্যুৎ—'৪ মাত্রার পূর্ণপর্ব + ২ মাত্রার ভাঙাপর্ব' গণনা বহাল রেখে পূর্ণপর্বসংখ্যা ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫ ধরে, (চাইলে আরও বাড়ানো যায়), ২, ৬, ১০, ১৪, ১৮, ২২ মাত্রাফেরে ছোটোবড় অসমান মাপের লাইনে-লাইনে, ভাবযতির খুশিমতো স্থান-সরণে, আমূল পালটে গেল মিশ্রকলাবৃত্তের দৃশ্যসজ্জা।

রামপ্রসাদ সেন, লালন ফকির-এর উত্তরাধিকার সত্ত্বেও, প্রাগাধুনিক অধ্যায়ে তো বটেই, উনিশ শতকের আদ্যভাগেও চতুর্মাত্রিক দলবৃত্ত-এর পরিসর ছিল অত্যন্ত আঁটো—ছেলেভুলোনা ছড়া, বড়জোর, বিদ্রূপাত্মক

ব্যঙ্গপদ্যে আটকা ছিল তা। কালান্তর হল ১৯০০ সালে—বেরোতেই রবীন্দ্রনাথের কৌতুক-পরিহাসে অশ্রুসজল *ক্ষণিকা*, অনুভূত হল, লঘু-চপলতাও গভীর হতে পারে, প্রকাশভঙ্গিমায় কত-না বহুমুখী, শক্তিধর দলবৃত্ত। এই বৃত্তে রবীন্দ্রনাথের নিরন্তর খাটাখাটনির মহার্ঘ্য অর্জন, ১৯১৮-র *পলাতকা—বলাকা*-র মিশ্রকলাবৃত্তের মতন পলাতকা-র দলবৃত্তও প্রবহমাণতায় আঙাভাঙা।

ইতস্তত, ছড়ানো-ছিটোনো পূর্বের কিছু নজির রইলেও, ১৮৯০ সনে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের *মানসী*-তেই (১৮৯০) যথাযথতায় সাকার হয় ৬ মাত্রার কলাবৃত্ত। এতেই তুষ্ট না থেকে আরও অগ্রসর হন রবীন্দ্রনাথ—ক্রমগঠিত হয়, চলনের গাণিতিক বিচারে বিভিন্ন, ৪, ৫, ৭ মাত্রার কলাবৃত্ত।

এরপর আরেক প্লাবন। গুছিয়ে-নিকিয়ে ঘর, একলম্ফে বাহিরে বেরিয়ে আসেন রবীন্দ্রনাথ। যেন, অকস্মাৎ আবিষ্কারের মত্ত আনন্দ—বৈশাখী ঝড়ের মতো ছুটে আসে, *পুনশ্চ* (১৯৩২), *শেষ সপ্তক* (১৯৩৫), *পত্রপুট* (১৯৩৬), *শ্যামলী* (১৯৩৬), (প্রধানত) গদ্যকবিতার চারটি সঞ্চয়ন। *পুনশ্চ*-র আগে তুলনীয় প্রচেষ্টার সাক্ষর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখায় কোথাও-কখনো এলোমেলো নিদর্শ মিললেও, রবীন্দ্রনাথেই প্রতিষ্ঠায় সার্থক গদ্যকবিতা।

রবীন্দ্রনাথের ছন্দকৈবল্যে মোহিত, আপ্লুত শঙ্খ ঘোষ। তথাচ, 'মুক্তছন্দ ও রবীন্দ্রনাথ' নিবন্ধে দক্ষতার সে অধিরাজকেই তাগ ক'রে ওঁচান তিনি অভিযোগের সশব্দ তর্জনী: ঘরে-বাইরে অমন প্রসার যাঁর, তিনি কেন পা ফেললেন না বারান্দায়, ছেড়ে

গেলেন তা উদাস উপেক্ষায়? বর্তমানে বাংলাছন্দসংসারে দৈন্যের পাংশুতা নেই, আছে বরং প্রাচুর্যের আধিক্য— রবীন্দ্রনাথেরই অধ্যাবসায়ে স্বয়ম্ভর আজ মিশ্রকলাবৃত্ত, দলবৃত্ত, ৪, ৫, ৬, ৭ মাত্রার কলাবৃত্ত, গদ্যকবিতা, চালবৈচিত্র্যে চার-চারখানি বাহারে ছন্দ-পরিকল্প; তাহলে অপরিস্ফুট কেন তায় পঞ্চম পরিকল্প, বেনিয়মিত গতিভঙ্গের vers libre/free verse/ মুক্তছন্দ/মুক্তবৃত্ত? শঙ্খ ঘোষের আশঙ্কা, উক্ত অনটনের জন্য রবীন্দ্রনাথই দায়ী: "রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মুক্তছন্দ প্রায় নেই, গদ্যছন্দের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বাংলা কবিতাকে যেন এক স্তর ডিঙিয়ে নিয়ে গেল"। অথচ, এমনও নয় যে রৈবিক ছন্দতত্ত্বভাবনায় ফ্রী ভার্স/মুক্তবৃত্ত গরহাজির। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে রবীন্দ্রনাথকেই দায়রা সোপর্দ করেন শঙ্খ ঘোষ। 'মুক্তছন্দ ও রবীন্দ্রনাথ'-এ ১৯৩৪ সালে ছাপা রবীন্দ্র-প্রবন্ধ 'গদ্যছন্দ' থেকে লম্বা এক উদ্ধৃতি জোড়েন তিনি। ওতে যে "একটি প্রাকৃত ছন্দের শ্লোক"-ভাঙা "অবিরল ঝরছে শ্রাবণের ধারা/...নিষ্ঠুর আমার প্রিয়তম ঘরে এল না"-র উদাহরণ আছে, তাতেই সপ্রমাণ, মুক্তবৃত্তের আন্দাজ প্রখরই ছিল তাঁর। তাহলে কেন, কোন্ নিষ্ঠুরতার বায়ুদোষে, সে প্রিয়কে জায়গাই দিলেন না রবীন্দ্রনাথ তাঁর খাসদরবারে, মাতলেন না "বন্ধন আর বন্ধনমুক্তির খেলা"য়?

তীব্র ভর্ৎসনা মিটেছে কী মেটেনি, আকস্মিক খাতবদলে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যায় 'মুক্তছন্দ ও রবীন্দ্রনাথ'। নজর পড়ে শঙ্খ ঘোষের রবীন্দ্রসংগীতে। সত্যি তো, নৃত্যনাট্যে, সবিশেষ তাঁর অন্তিম নাট্যনিবেদন *শ্যামা*-য় (১৯৩৯), যা আবার আদ্যোপান্ত

সুরে ঢালাই করা, মিশ্রবৃত্তের ভূরিপ্রয়োগ রয়েছে! কবুলে বাধ্য হন শঙ্খ ঘোষ: "এমনসব রচনা আমরা দেখতে পাচ্ছি যাকে মুক্তি না বলা অসম্ভব, এমনই বহুল তাঁর চর্চা, অমিতাচার সত্ত্বেও তার ভিতরকার পদ্যস্পন্দ এতই প্রত্যক্ষগোচর"। এর মানে, যে মিশ্রবৃত্তকে কবিতার সিংহদুয়ার পেরোতে দেননি রবীন্দ্রনাথ, তাকেই খিড়কিদোর দিয়ে সুরের আসনে বসিয়েছিলেন তাঁর আমদরবারে। "অভ্যন্তরীণ" বোঝাপড়াতে, মীমাংসার শান্তিকল্যাণে সমাধা মিশ্রবৃত্ত নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শঙ্খ ঘোষের দ্বৈরথ। এই মৌকায় আরও দু-কদম বাড়ান উনি।

শঙ্খ ঘোষের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *দিনগুলি রাতগুলি* (১৯৫৬)। অনেকটা যেন তার শেষের কবিতা ৬ মাত্রার কলাবৃত্ত 'আড়ালে'-র ধুয়ো "তোমাকে বক্‌ব, ভীষণ বক্‌ব/আড়ালে"-র আদলে রবি-আড়ালে উত্তর-রবীন্দ্রোত্তর পাঠক ও কবিসমাজকে একপ্রস্থ টোকে-ঠোকে নাজেহাল ক'রে ছাড়েন তিনি 'মুক্তছন্দ ও রবীন্দ্রনাথ'-এ: নেহাৎ আলস্যের ঢিলেমিবশত, হালফিলের পাঠক ভাবতে অভ্যস্ত, "আজকের কবিতামাত্রেই গদ্যকবিতা"; (হরদম রবীন্দ্রসংগীত শুনেও), এদানির কবিদের লেখাপত্রে একরকম অনুপস্থিত মিশ্রবৃত্ত—যেটুকু-বা আছে, তার পেছনে নেই "সচেতন পরিকল্পনা", আছে শুধু মাত্রাসাম্যরক্ষায় "অমনোযোগ"।

রবীন্দ্রনাথের মতন ঝংকারে-ঝংকারে সরব নন—তবু, ১৯৬১-তেই, সমসাময়িক আধুনিককুলোদ্ভব কবিদের অনুচ্চ সমালোচনায় মুখর রবি-উপাসক শঙ্খ ঘোষ। তখন কি জানতেন উনি...

কাব্য বা নাট্য নয়, বিশ শতকের সাতের দশকে, ভিন্ন-এক শিল্পমাধ্যমে অনুজদের সৃষ্ট রূপবিভঙ্গ সম্পর্কে ওই মাধ্যমেরই অগ্রজ-প্রধান হেনেছিলেন শেলতীব্র বক্রোক্তি। আর, হল কী, না, নয়ের দশকে, ধিক্কৃত সেই 'নবতরঙ্গ'-এরই এক হোতার নতুন এক পরীক্ষাতে খানিক অজ্ঞাতসারেই জুটে যান শঙ্খ ঘোষ; সেই সহ আমি, তাঁর লেজুড় হিসেবে।

৬

১৯৭১ সালে, শিরোনামে প্রশ্নবোধক চিহ্ন, বেরোয় সত্যজিৎ রায়ের প্রবন্ধ, 'An Indian New Wave?'/'ভারতীয় নবতরঙ্গ?' (দ্র. *Our Films Their Films*)। সংশয়-লাঞ্ছিত সে জিজ্ঞাসার তিন বছরের মাথায়, ১৯৭৪ সনে ছাপিত সত্যজিৎ রায়ের আরেক প্রবন্ধ, 'Four and a Quarter' (দ্র. *Our Films Their Films*)। এটি ছিল টাটকা চারখানি হিন্দি পূর্ণদৈর্ঘ্যের ও একখানি ক্ষুদ্র-আয়তন নির্বাক ছবির পর্যালোচনা। 'An Indian New Wave?'-এর অন্যতম প্রতিপাদ্য: মৃণাল সেন-এর *ভুবন সোম* (১৯৬৯) চলচ্চিত্রটিকে যে লোকে 'off-beat'/'খাপছাড়া' আখ্যা দিচ্ছে তা সর্বৈব ভ্রান্ত; কেননা, স্বল্পসংখ্যক দর্শক মধ্যে ওই ছবিটি যা সমাদর পেয়েছে, তার মূলে, মাঝেসাঝে অন্বয়ে ফেরাফেরি সত্ত্বেও, আছে, মারাত্মক জনপ্রিয়, গতানুগতিক প্রথাপ্রচলের আকর্ষণ।

মৃণাল সেন মৃদুল আপত্তিতে ছাড় পেলেও, 'Four and a Quarter'-এ 'নবতরঙ্গ' ধারার দুই অগ্রণীনায়ক, মণি কল্ ও কুমার সাহনি-র ওপর রীতিমতো খড়্গহস্ত সত্যজিৎ। অভিযোগ

তাঁর: পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউট -এ ঋত্বিক ঘটকের সরাসরি ছাত্র হওয়া নিয়ে শত বড়াই মণি ও কুমার-এর, তথাপি, কিচ্ছু শেখেননি এঁরা এঁদের শিক্ষক থেকে; জোরদার পরিস্থিতি, সংসক্ত চরিত্র, সামাজিক সমস্যা, ইত্যাদির অবতারণায় বিশিষ্ট ঋত্বিকের প্রতিভা—অপরদিকে, ওগুলিরই শোচনীয় অভাব মণি-কুমারের ক্যামেরা-ব্যবহারে, সম্পাদনার কারিকুরিতে; পথভ্রষ্ট, অসার, নেহাৎ ঠুনকো নান্দনিকতা টেনে এনেছে এঁদের রোগশয্যার শিয়রপ্রান্তে; মণি কল্-এর চেয়েও নিরেস কুমার সাহনি—কুমারের *মায়াদর্পণ* (১৯৭২) নিম্নমানের মনস্তত্ত্ব ও তৎঅধিক নিম্নমানের আঙ্গিকের এমন একখানি যুগলবন্দি যে, আড়ষ্ট অভিব্যক্তির চোটে ভালো-খারাপ অভিনয়ে ফারাক কষাই দুষ্কর তাতে; গুরুদেব ঋত্বিক ঘটকের একমাত্র যে জিনিসটি আপনিয়েছেন মণি-কুমার, সেটি, দুর্ভাগ্যবশত, ঋত্বিকের "humour", হাস্যরসে সাতিশয় ঘাটতি।

১৯৯২: সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যু।

১৯৯৫: কুমার সাহনির কলকাতায় আগমন। পাই সংবাদ, এবারে তাঁর কলকাতায় আসার উদ্দেশ্য, রবীন্দ্রনাথের *চার অধ্যায়* অবলম্বনে চলচ্চিত্র বানানো। জেনে, খুব যে উত্তেজিত হই, তা নয়। খটকাই লাগে বরং: কেন *চার অধ্যায়*? নেই *চতুরঙ্গ*? বন্ধুবান্ধবদের মারফতিতে সত্বর পরিচয় হয় কুমারের সঙ্গে। প্রথম দর্শনেই বুঝি: স্মিতহাস্য, সৌম্যকান্তি কুমার, ভব্যতার পরাকাষ্ঠা; ভদ্রতায় বাঙালি ভদ্রলোকের মডেলযোগ্য। কেন *চার অধ্যায়*? আমার করুণ এ আর্তিকে নিবৃত্ত করতে যা বলেন কুমার, তাতে

চমকেই যাই। পড়ান পাঠ: উপন্যাস আর নাটকে ভেদরেখা মোছা, সাহিত্যবর্গের চলতি সংস্কার মোতাবেক চেপে-বসা ঘেরাটোপ খোলা, *চার অধ্যায়*-এর বিশেষতা; সে-জন্যই, চলচ্চিত্রায়নের সদর দরজা বিলকুল হাট তাতে; তদুপরি, নায়কের হাতে নায়িকার খুন ও নায়কের আত্মহত্যা সত্ত্বেও নাট্যোপন্যাসটি "life assertive", জীবনমুখিতায় ইতিবাচক। উপযোগিতার এ ব্যাখ্যায়, গুপ্তসমিতির পাণ্ডা ইন্দ্রনাথের বাগ্‌ডম্বর সম্পর্কে অনিবারণীয় অস্বস্তি সত্ত্বেও, মানতে বাধ্য হই, স্বদেশিযুগের বঙ্গীয় সন্ত্রাসবাদকে ঘিরে ট্র্যাজিক ও রবীন্দ্র-আখ্যানে মজুত রয়েছে আমার সে-যাবৎ অজানা বারুদে ঢের মশলা।

মাসকয়েক কেটে গেছে। সাল ১৯৯৬, চুকেছে *চার অধ্যায়*-এর সুটিং, হচ্ছে সম্পাদনা।

একদা একদিন, আচমকা আমার বাসায় উপস্থিত কুমার। কিন্তু, এ কী চেহারা? কোথায় গেল সেই শান্তস্নিগ্ধ মুরত, চিকন-কোমল, বিনীত ভাষ? চুল উস্কোখুস্কো, মেজাজ তেরিয়া, আমার বাড়িতে ঢোকা ইস্তক চলছে কুমারের ত্যান্ডাইম্যান্ডাই। এ কোন্ বেতাল চাপলে আমার ঘাড়ে? সব্বনেশে *চার অধ্যায়*-এর অভিভবে

কি কুমারের মনঃপ্রদেশ এখন রূপান্তরে মার-মার আতঙ্কবাদী?

কুমারের হম্বিতম্বি তড়পানি হতে যেটুকু ঢুকল কানে তা এই: নির্মীয়মাণ *চার অধ্যায়* ছবিটি আধুনিক বঙ্গীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর ব্যক্তিক শ্রদ্ধাঞ্জলি; এক অধ্যায় থেকে আরেক অধ্যায়ে যেতে আছে তাতে উপন্যাসের সঙ্গে সংস্রববিহীন তিন বিরতিফাঁক; অমনই এক ফাঁক পূরণে দরকার তাঁর রবীন্দ্রনাথ ও শঙ্খ ঘোষের দুটি কবিতার জোড়সংগত; এবং, সে পদ্যমন্তাজে ফুরনের ভার এ বেচারার দুবলা কাঁধে; বন্দোবস্ত সারা—আগামীকাল স্টুডিওতে রেকর্ড হবে বর্ণসংকরে পদ্য, শঙ্খ ঘোষ স্বকণ্ঠে পাঠ করবেন সেটি; সুতরাং, চটপট চটপট লাগো কাজে—তিন ঘণ্টার ভেতরেই ফিরবেন পরিচালক মহোদয়, দেখবেন, উতরল কি-না আমার ছিন্ন দু-টুকরার আঠা-সাঁটা কাব্যকম্ম।

চক্ষু বিস্ফারিত আমি, এক্কেবারে হাঁ। তখনও পর্যন্ত আমি যে *চার অধ্যায়*-এর একটি শট্‌ও চাক্ষুষ করিনি! ঝঞ্ঝাবৎ কুমারের প্রবেশন, নিষ্ক্রমণও তা-ই। বেরোতে উদ্যত তিনি, কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম, শুধোই ভয়ে-ভয়ে, অভিপ্রেত তাঁর বিরতিফাঁকের মুখ্য প্রতিমা কী? জবাব এল দোরগোড়া থেকে, "hands"।

হাতের নাড়ু 'হাত'। কিন্তু, মিহিন ও ইশারাতেই ঘটল জাদু। চকিতে ঝলকে উঠল মনে, 'আজি বিজন ঘরে নিশীথরাতে' (১৯১৮) রবীন্দ্রসংগীতের কলি, "আছে তো হাতখানি"। স্থির করলেম ওই গানই হবে আমার রিফুগরির সাধনযন্ত্র।

রবিগীতিতে প্রায়শই রয় ধ্রুপদ ন্যায় চার তুক: 'স্থায়ী', 'অন্তরা', 'সঞ্চারী', 'আভোগ'। এদের মধ্যে সবচাইতে অভাবনীয় তিনের তুক, সঞ্চারী। সেখানে অতর্কিতে পালটায়

স্থায়ী ও অন্তরায় তদবধি প্রস্তুয়মান গঠন, বিনা মেঘে সহসা-বিজুলির উদ্ভাসে টোটে বুঝি পারম্পরিকতার শৃঙ্খল—টানা দু-লাইন স্বর সেথায় অত্যল্প, স্তিমিত, ওঠা-পড়ার ঢেউ; বাণীও স্থায়ী-অন্তরা হতে যোজন-যোজন দূর। মিতচারিতায় অচিন্তনীয় সঞ্চারী; আবেশে তার আশঙ্কা না হয়ে যায় না শ্রোতার, গানটি কি আভোগ পেরিয়ে স্থায়ীতে আবার দাঁড়াতে পারবে?

সিদ্ধান্ত নিই: স্থায়ীর 'আজি বিজন ঘরে নিশীথরাতে' ও অন্তরা ছেঁটে স্থায়ীর বাকি অংশ ও আভোগ বহাল রেখে, সঞ্চারীকে অন্তরায় ঠেলে, জায়গা পাতব নতুন সঞ্চারীর; এবং, সে শূন্যস্থান ভরবে শঙ্খ ঘোষের কবিতা।

খুলি এবার শঙ্খ ঘোষের *কবিতাসংগ্রহ*। পাতা ওলটাতে-ওলটাতে চোখ আটকে যায় 'ভূমধ্যসাগর'-এ (*তুমি তো তেমন গৌরী নও*, ১৯৭৮)। কেটেকুটে বানাই তাথেকে সঞ্চারী; জুড়ি সেটি ভাঙা রবিগানে। সবয়ব হয়:

আসবে যদি শূন্য হাতে—
আমি তাইতে কি ভয় মানি!
জানি জানি, বন্ধু, জানি—
তোমার আছে তো হাতখানি।।

আঁধার থাকুক দিকে দিকে আকাশ-অন্ধ-করা,
তোমার পরশ থাকুক আমার-হৃদয়-ভরা।

তুমি ব্যাপ্ত করো আর্দ্র হাত
এসো, সব সাজ খুলে ফেলি,
দুই হাতে আপন্ন সংসার
নিয়ে চলো ঘরে।

জীবনদোলায় দুলে দুলে আপনারে ছিলেম ভুলে,
এখন জীবন মরণ দু দিক দিয়ে নেবে আমায় টানি।।

মার দিয়া কেল্লা, পনেরো মিনিটেই খতম ফোঁড়াই-সেলাই! আচ্ছা, 'বিজন ঘরে নিশীথরাতে'-র আড়ঠেকায় দলবৃত্ত ও 'ভূমধ্যসাগর'-এর *বলাকা*-সদৃশ মিশ্রকলাবৃত্তের মিশেলে কি উৎপন্ন হল সাধারণত অলক্ষগোচর মিশ্রবৃত্ত, শঙ্খ-কাঙ্ক্ষিত সেই মুক্তছন্দ? বোধহয় না। যাক্‌গে, নবজাতকটির উপর যে একা আমারই নির্ব্যূঢ়স্বত্ব, রবীন্দ্রনাথ তথা শঙ্খ ঘোষের নেই তাতে তিলটুক্ রিক্থভাক্, নিদেন সে-ব্যাপারে নিঃসন্দিগ্ধ আমি।

সময় আর কাটে না—উদ্দীপিত আমি, কুমারের পুনঃআগমে উদগ্রীব, কাঁপি রোমবিকারে। খুব তো চোটপাট তড়পানি ছিল *চার অধ্যায়*-এর নয়া ভাষ্যকারের, এবার! এলেই হানাদার, নেব বদলা—আমা-রচিত পদ্য-কোলাজ ছুড়ে দেবো হামলাবাজের নাকের সামনে।

আড়াই-তিন ঘণ্টার পরের দৃশ্য: সোফায় উপবিষ্ট কুমার, ছাত্রোচিত নম্র; বোঝাচ্ছি আমি, রবিগানের চালচিত্র, চার তুকের অন্তঃগড়ন, 'বিজন ঘরে নিশীথরাতে' ও 'ভূমধ্যসাগর'-এ হাত-বিনিময়ের রসায়ন-কৌশল, শোনাচ্ছি, আমার জোড়াতালি-মারা পদ্যের কেজো ইংরেজি তর্জমা। খানিকক্ষণ চুপ কুমার। বললেন তারপর, "Right! সঞ্চারী principle-ই আমার *চার অধ্যায়*-এর চালিকা principle"। কী কিপটে রে বাবা! নেই প্রশংসার নামগন্ধ, আপন সৃজনেই বিভোর সিনেমাজগতে 'নবতরঙ্গ'-এর অগ্রদূত। বিদায়ের আগে ফের হুমকি, "কাল সকাল আটটা

নাগাদ আসছি আমরা। ডাক পেলেই তড়বড়িয়ে নিচে নামবে। এক সেকেন্ড দেরি যেন না হয়”।

কুমারের তোল্লাই পাই না পাই, আমি তো জানলেম, হস্তশিল্পে, সুতোয়-সুতো মাকু ঘুরিয়ে টানা-পোড়েনে খলিফা এ শর্মা—আত্মউদ্ভাসের উচ্ছ্বাসে পা পড়ে না ভুঁয়ে। ফ্যাসাদ কেবল, দ্রব্যগুণে ভারি স্বল্পায়ু গর্ব। তখনও পোয়াচ্ছি তুষ্টির ওম-আরাম, সহসা গ্রাস করে আশঙ্কা—আমার পদ্য-নৈবেদ্য যদি না-পসন্দ হয় শঙ্খবাবুর, কাল যদি ‘ভূমধ্যসাগর’-এর অঙ্গহানির অসন্তোষে আড়ালে নয় সর্বসমক্ষেই হাঁকেন, “তোমাকে বক্‌ব, ভীষণ বক্‌ব”, তাহলে? আশু হেনস্থার আতঙ্কে চড়ে গাত্রতাপ, কিছুক্ষণেই তা ১০৪ ডিগ্রি ছুঁইছুঁই। লেপ-কম্বলে মুড়ে ক্ষীণাতিক্ষীণ দেহবল্লরী, গুটিয়ে-সুটিয়ে, দুমড়ে-মুচড়ে আশ্রয় নিই কুমার-পরিত্যক্ত সোফায়—তাতে আরও বাড়ে জ্বালা।

পরদিন কুমারের আহাব এলে, কম্বলে-ঘর্মকে জড়াপট্টি, টলমলিয়ে আস্তে-আস্তে সিঁড়ি বেয়ে নামি নিচে। দেখি, দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি, এবং আমার অপেক্ষায় ফুটপাথে দণ্ডায়মান কুমার ও শঙ্খবাবু। ভূততাড়িত আমি, নিঃসাড়ে বসি চালকের পাশে। আমার দুর্দশায় দয়াপরবশ, দুজনের কেউ যাত্রাপথে মম পদ্য-সামগ্রী লয়ে রা-টি কাটেন না। জোরো তন্দ্রায় ঝুম, পৌঁছই গন্তব্যে।

স্টুডিওতে কুমার; বাইরে, নিরালায় আমরা। সস্নেহে জিগোন শঙ্খবাবু, “হয়েছে লেখা?”। হিলহিলিয়ে বাড়িয়ে দিই আমা-চয়িত আখরমালা। চিরকুটটিতে বার দুই চোখ বুলিয়ে বলে ওঠেন শঙ্খবাবু, “বাহ্! বেড়ে হয়েছে। এটাই আমি পড়ব”। এক

ছবি: সোমনাথ ঘোষ

কুমার সাহনি শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে

ঝটকায় জ্বর হাওয়া, গায়ের তাপমাপ স্বাভাবিকের স্বাভাবিক, ৯৮.৬ ফারেনহাইট।

দ্বিতীয় টেক্-এই সম্পন্ন কাজ—হাতে-হাত বিরতিফাঁকের শট্সমূহে খাপে-খাপ গেঁথে গেল শঙ্খবাবুর পাঠ। এরপরই

সাংঘাতিক বিপর্যাস। তখনও শঙ্খবাবুর গ্রামভারি অনতিমন্দ্র আওয়াজে গমগম করছে স্টুডিওঘর, মাইক্রোফোন সমীপে দৌড়ে আসেন, যে-সে নয়, বাংলা ছায়াছবির যশস্বী কারিগর, *চার অধ্যায়*-এর শব্দযন্ত্রী স্বয়ং:

শব্দযন্ত্রী (সক্রোধে)। এটা কী হচ্ছে মশায়! এর নাম আবৃত্তি! Feeling কই?

আমি (কুঁইকুঁই)। কিন্তু, এ তো ওঁরই-

শঙ্খবাবু (জলদগম্ভীর)। এরকমই হবে-

বিফলমনোরথ, গজরগজর করতঃ স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন প্রখ্যাত শব্দযন্ত্রীর। মিটল ঝামেলা।

১৯৯৭ সনে মুক্তিপ্রাপ্ত, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে সঞ্চারী-যোজিত, কুমার সাহনি পরিচালিত *চার অধ্যায়*-এর প্রিন্টে, টোকাটুকির এলেমে বানানো আমার পদ্য-পাঞ্চ অদ্যাপি অক্ষত অম্লান শঙ্খ ঘোষের আপাত-নিস্পৃহ, নিরাবেগ ব্যারিটোনে।

কলকাতাবাসীদের উষ্ণ সাহচর্যে, বহুজনের নিঃস্বার্থ সহযোগিতায় উৎফুল্ল, মুম্বাই থেকে ১৮ এপ্রিল ১৯৯৭-এ, ব্যক্তিগত পত্রে লেখেন আমায় কুমার: "…the spirit of Calcutta has always meant to me [to be that of] R.T. and R.G."/'আমার কাছে কলকাতার আত্মন্, র.ঠ. ও ঋ.ঘ.-র আত্মন্'। কুমারের প্রাণশক্তিময় পুরুষদের তালিকায়, লক্ষণীয়ভাবেই নেই S.R.— আছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আছেন ঋত্বিক ঘটক, নেই সত্যজিৎ রায়। বছর ক'পর যখন শোনেন কুমার, আমি না-কি 'নবতরঙ্গ'-

বিদ্বিষ্ট, সাহনি-বিরূপ সত্যজিৎ-এর *অরণ্যের দিনরাত্রি* (১৯৬৯) সম্বন্ধে 'Ray's Memory Game' নামক দীর্ঘ এক প্রবন্ধ ছকেছি, তখন রুখতে পারেন না উষ্মা; ধমকান আমায়, "আজেবাজে জিনিস নিয়ে বেকার সময় নষ্ট করো কেন?"।

যা-ই হোক, *চার অধ্যায়* সমাপনে এই আশ্বাসে মুম্বাই ফেরেন কুমার, শহর হতে যেই অপসৃত সত্যজিতের কায়াছায়, অমনি এদ্দিন যে-সকল পাথরচাপা-কপাল কলকাত্তাই প্রতিভা গুমরে-গুমরে মরছিল, মাথা তুলছে উহারা।

বলা নিষ্প্রয়োজন, সত্যজিৎ রায়ের প্রতি সম্ভ্রম, তাঁর কারুদক্ষতা প্রতি দরদ, আমরণ জাগরূক ছিল শঙ্খবাবুর চিত্তে। কেন, ওঁর আশি বছর বয়সে প্রকাশিত *প্রতি প্রশ্নে কেঁপে ওঠে ভিটে* (২০১২) বইতে কি যৌবনের দিনগুলি ঘিরে স্মরণ-মন্থন 'পুরোনো কলকাতা বয়ে যায়' কবিতাতেও নেই, ১৯৫৫-র মায়াবী সে-মুহূর্তের উল্লেখ, "'পথের পাঁচালী' নিয়ে বিকেলের সংবর্ধনা নেবেন মানিক"?

অবশ্য, স্মৃতিবিস্মৃতির, ঝলমলে আলোহাওয়া আর দুপ ক'রে ঝাঁপা আঁধারের আঁকিবুকিতেই জাফরি-কাটা শঙ্খ ঘোষের কাব্যঝরোকা...

৭

অনেকক্ষেত্রে, মাছের তেলে মাছ ভাজার মতো, ভাষিক কলকব্জা সাহায্যে নিষ্পন্ন হয় শঙ্খ ঘোষের কাব্যিক বিস্তার; ছন্দবিজ্ঞান, ব্যাকরণশাস্ত্রের পদাবলিতে ভাষিত তখন তাঁর

তেরছা রাজনৈতিক উচ্চার। এই যেমন, অর্থে বহু বাংলা ‘দল’—কোথাও বোঝায় তা ‘শলাকা’, ‘খণ্ড’, ‘অঙ্কুর’, ‘পাতা’, ‘পাপড়ি’, ‘কোষ’, ‘বিদীর্ণ হওয়া’; অন্যত্র তা ‘সমূহ’, ‘গণ’ বা ‘পক্ষ’-বাচক (হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*); ছন্দোলোকে মানে তার, ‘ধ্বন্যাঘাত’ বা ‘syllable’, রয় যাতে, যতই থাক ব্যঞ্জন, একটি এবং একটিই স্বরবর্ণ।

যে দেশের সবচেয়ে গুরুত্বময় সমস্যা পক্ষবিচার, “ভুখা মুখে ভরা গ্রাস তুলে ধরবার আগে প্রশ্ন করো তুমি কোন্ দলে”; যেখানে “সকলেরই কটিবন্ধে অগ্নিছন্দে ছোটো ছোটো গণতন্ত্র বাঁধা”; যে দেশ সম্বন্ধে কোনো ঋষি ভবিষ্যদ্বাণী ক’রে গেছেন, “তুমি বলেছিলে দল হবে দল হবে/দলের বাইরে থাকবে না কিছু আর”; যেখানে ‘আমরা-ওরা’ ভাগাভাগি স্বতই ভঙ্গুর, “আমরা দল বদল করেছি/হয়ে গেছি ওরা”; যথায় পারস্পরিক বিনিময়ের ধরণ, “তুমি বললে বিপ্লব/আমি প্রতিক্রিয়া”—এমৎ ভূখণ্ডের জনগণকে এই ব’লে শলাকা-বিদ্ধ করেন হৃদয়-বিদীর্ণ কবি, “দলের ভিতরে যারা দলবৃত্তে অন্ধ” (‘তুমি কোন্ দলে’, *লাইনেই ছিলাম বাবা*, ১৯৯৩; ‘ঘূর্ণমান, *শুনি শুধু নীরব চিৎকার*, ২০১৫; ‘তুমি বলেছিলে জয় হবে জয়

হবে', *সমস্ত ক্ষতের মুখে পলি*, ২০০৭; 'বদল', *সমস্ত ক্ষতের মুখে পলি*, ২০০৭; 'তুমি আর নেই সে তুমি', *বন্ধুরা মাতি তরজায়*, ১৯৮৪; 'শহিদশিখর', *ছন্দের ভিতরে এত অন্ধকার*, ১৯৯৯)।

কবির অভিপ্রায়, আসুক সে লগ্ন "ছন্দ যখন মশাল জ্বালে" রক্তে; কিন্তু, চারপাশ তাঁর নিস্তরঙ্গ "আপাতত শান্তিকল্যাণ"-এ; এমন সমতল, নিস্তেজ তাঁর বাস-আবহ যে, নিজেকেই প্রশ্ন করতে বাধ্য হন, "ছন্দের ভিতর এত অন্ধকার জেনেছ কি আগে?" ('বাঘ', *বন্ধুরা মাতি তরজায়*, ১৯৮৪; 'আপাতত শান্তিকল্যাণ', *বাবরের প্রার্থনা*, ১৯৭৬; 'ছন্দের ভিতরে এত অন্ধকার', *ছন্দের ভিতরে এত অন্ধকার*, ১৯৯৯)। "কবিতা মুহূর্ত চায়, শিকড়ে সর্পিল স্বাধীনতা" প্রতীতিতেই কদম-কদম বাড়ান পা কথক; প্রার্থনা, "শিরোনামে নয়, তুমি নেমে এসো পঙ্‌ক্তির ভিতরে"; তথাপি, থেকে-থেকেই জাগে ধন্ধ, "বুকের ছন্দ কি আজও তেমনই ছন্নছাড়া?"; ছন্দের বাতিঘর রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্যে রেখেও পণ্ড কবির নাবিকী জলসফর, বন্দরে ভিড়লে ভেলা প্রায়শই হেরেন তিনি, মুঠোয় তাঁর সেই গতানুগতিক দ্বিপদী, থোড়-বড়ি-খাড়া আবহমান, "মাঝে মাঝে দেখি শুধু পর্বগুলো দীর্ঘ করে নিয়ে/সে যখন শোয় তার ছন্দও পয়ারে শুয়ে থাকে" ('মুহূর্ত', *প্রহরজোড়া ত্রিতাল*, ১৯৮২; 'বিষণ্ণকরণী', *ছন্দের ভিতরে এত অন্ধকার*, ১৯৯৯; 'কিছু লাল তবু', *ছন্দের ভিতরে এত অন্ধকার*, ১৯৯৯; 'ছন্দ', *প্রহরজোড়া ত্রিতাল*, ১৯৮২)।

কথকের মনে কখনও ব্যাকরণের অনুষঙ্গে জাগে সংহতির স্বপ্ন, "কোনো বিশেষণে বেঁধো না ওকে/ওকে ছেড়ে দাও সহজ ক্রিয়ায়/...বিশেষ্যভরে একদিন যদি/পৌঁছতে পারে সর্বনামে";

কখনও-বা নামরূপেরই চতুরতায়, বিশ্বাসভঙ্গে চুরমার সে-স্বপ্ন, "তুমি কর্তা? না কি অন্য কারো/ক্রিয়াকর্ম তুমি?" ('নামরূপ', *ছন্দের ভিতরে এত অন্ধকার*, ১৯৯৯; 'প্রতিদিন', *গোটাদেশজোড়া জউঘর*, ২০১০)।

শঙ্খ-কাব্যের অন্যতম স্থায়ী *মহাভারত*। বর্ণিল সে 'ইতিহাস'-এর আয়নায় এমনই ট্যারাবাঁকা বিম্বিত বহমান ইতিহাস, যে, ওই স্থায়ীতেই বর্তায় সঞ্চারীর আলোড়। *মহাভারত*-এর উপপর্ব 'জতুগৃহ'-এ নিরীহ নিম্নবর্গীয় নিষাদজননী সহ পাঁচ নিষাদ-যুবার আগুনে আগুনময় গুমখুন সূত্রে শঙ্খ ঘোষের গোটা এক বইয়ে শুধু "শিরোনামে নয়", ঝরে অবমানিতের রক্তপ্রপাত "পঙ্‌ক্তির ভিতরে": *গোটাদেশজোড়া জউঘর*। কতখানি দেশজোড়া ওই জতুগৃহ, তার ভৌগোলিক নির্ধার, "এখানে ওখানে বানিয়ে রেখেছি/বুকফাঁপা ঘুমে আততায়ী ঘর"; আততায়িতার যে ব্যাকরণ বৈশ্বিক আজ, গড়েছিল যা অশ্বত্থামা 'সৌপ্তিকপর্ব'-এ, মন্ত্রগুপ্তি তার, "এসো.../অস্ত্রহাতে ঢুকে পড়ি অতর্কিতে ঘুমন্ত শিবিরে"; 'মৌষলপর্ব' পুনঃকহনে ওঠে দলগত অবরোধের প্রসঙ্গ, "পলকে পলকে ছিল অপমান/...তোমাদের হাতে ছিল হাড়ভাঙা দলীয় নিশান"; দীর্ঘ কবিতার আস্তরণ অন্তরালে উন্মোচিত ফের যাদববংশধ্বংস, "পায়ের ক্ষুরে জয়ধ্বনি, আঙুলচুড়োয় জয়ধ্বনি"; 'উদ্যোগপর্ব'-এ কর্ণের দেখা দুঃস্বপ্ন, কুরুক্ষেত্রে আসন্ন বিনষ্টির উদ্ভাস, দেয় আচরাচর যে সমূহ বিনাশ অবধারিত, তার বিসার, "ভবিষ্যৎ নতুন পৃথিবী/যেখানে কোথাও কোনো মানুষের চিহ্নমাত্র নেই/...জমিয়ে রেখেছে শুধু

চারপাশে আণবিক ভার"; মরণের ব্যাপক সব আয়োজন হেরেই হয়তো 'আরণ্যকপর্ব'-এ যে ধর্মবক সওয়ালের প্যাঁচে-প্যাঁচে নাজেহাল করেছিলেন যুধিষ্ঠিরকে, তিনিও মূক এখন, "দেখছেন ধর্মবক/প্রশ্নভার নিয়ে নয়, উত্তরের মহিমায় মূঢ়"; যে জগৎ সৌজন্যময়, দরকারে, দাঁতনখে উদগ্র প্রচণ্ড, সে সময়কালের ক্রিয়াকর্মে বেহাল জীয়ন্তদের প্রবোধ জোগাতে মজুত কর্তাদের সঠেস *গীতা* ২/৪৭, "বাঁচো, প্রবল বাঁচো, কেবল/মা ফলেষু কদাচন"; বিহারে, ১৯৮৬ সালে আরোয়াল জনপদে দলিত, তফশিলি জাতির মানুষদের ভূস্বামী-পোষা ভূমিসেনা কর্তৃক গণহত্যা—এই পরিপ্রেক্ষিতেই সমুদ্ভব "রাজ্যশিরে" আসীন জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র, ভয়বিহ্বল তাঁর বিলাপ "এখন আমার মনে পড়ে বেদব্যাস যা বলেছিলেন/নিদেনকালে সমস্তদিক নাশকচিহ্নে ছড়িয়ে যাবে/সন্ধ্যাকাশে দুই পাশে দুই শাদালালের প্রান্ত নিয়ে/কৃষ্ণগ্রীব মেঘ ঘুরবে বিদ্যুদ্দামমণ্ডিত", প্রতাপলোপের আশঙ্কাঘোরে আর্তনাদ "ধানজমিতে খাসজমিতে সমবেত লোকজনেরা/ধেয়ে আসছে সামন্তদের" এবং, তৎসত্ত্বেও আর্জি তাঁর "শোনাও আমায় শোনাও আমায় শেষের সেদিন হে সঞ্জয়!" ('জতুগৃহ', *প্রহরজোড়া ত্রিতাল*, ১৯৮২; 'সৌপ্তিক পর্ব', *গোটাদেশজোড়া জউঘর*, ২০১০; 'যাদব', *তুমি তো তেমন গৌরী নও*, ১৯৭৮; 'আমাদের এই তীর্থে আজ উৎসব', *মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে*, ১৯৮৪; 'কর্ণের স্বপ্ন', *মাটিখোঁড়া পুরোনো করোটি*, ২০০৯; 'জয়সীমা', *হাসিখুশি মুখে সর্বনাশ*, ২০১১; 'সহজ পাঠ', *ধুম লেগেছে হৃৎকমলে*, ১৯৮৭; 'অন্ধবিলাপ', ধুম লেগেছে হৃৎকমলে, ১৯৮৭)।

হননে-প্রতিহননে রক্তলিপ্ত *মহাভারত*; মানবিক হৃদয়দৌর্বল্যকে শঠ-চালিয়াতের নিজ স্বার্থে উপযোগ, নির্জিতের আরোই বঞ্চনা-সাধন, ইত্যাদি প্রভৃতি কদর্য কারবারেরও কমতি নেই তাতে। আবার, ওই মহাকাব্যেই আছে অনুক্রোশ নাম্নী সদ্‌বৃত্তির ভূয়ষী প্রশংসা। ক্রোশ মানে, "রোদন, আহ্বান, চীৎকার"/"to cry out, shriek, weep" (হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*; Monier-Williams, Monier, *A Sanskrit-English Dictionary*)। আর, 'যে ক্রোশ বা কাকুতি উদ্‌গত হয় অন্য কারও ক্রোশের অনু বা পশ্চাতে, পরের কাতর ডাকের অনুবর্তনে'/'crying out that follows someone else's cry', তা-ই *অনুক্রোশ*। দুর্গতের ব্যথার একাত্মতায়, অবহেলিত বা নিষ্পিষ্টের সহিত সমানুভূতির ডোরবন্ধনেই উক্ত অনুভবের মহিমা।

শঙ্খ ঘোষ ওয়াকিবহাল, সমাজের যে অলিন্দে তাঁর ঘোরাফেরা, সেখান থেকে নিচে তাকালে শিক্ষাদর্পীদের স্বভাবতই মনে হয়, "পালটে দিতে পারি ভুবন/আখ্যানে-ব্যাখ্যানে—/জীবনযাপন? করবে সেটা/চাকরবাকরেরা"; একদিন হয়তো "খোল-

নলিচা পালটে বিচার করবে নিচু জনে", কিন্তু, কলির ও কাল এখনও সুদূরপরাহত বুঝে "কুমির কান্না"য় গৎ ধরেন গরিব-পরাণ ভদ্দরজনেরা, "হা, বিপ্লবের সব মাটি সাহারা"—অমনই এক "মস্ত পরিত্রাতা" বাবুমশায়কে কথকের পরামর্শ, "হেঁটে দেখতে শিখুন ঝরছে কী খুন রাতের মাথায়/আরেকটা কলকাতায় সাহেব আরেকটা কলকাতায়"; ওপরের ওই থাক হতেই কেউ, ক্ষমতাচুর কোনো পোশাকি বামপন্থী, গর্জাতে পারে সহজে, 'লাইফ হেল ক'রে দেব', বাঁকা প্রতিধ্বনি যার, "সবার জীবন/দিয়েছি নরক করে/...বজ্রকঠিন রাজ্যশাসনে/সেটাই স্বাভাবিকতা"; 'ধর্ষিতা নারী যেহেতু বেশ্যা, সেহেতু...', বামমার্গী পার্টির এক মহিলা মুরুব্বির এমনতরো মন্তব্যের সম্প্রসারণে আসে প্রবাদতুল্য বাক্য "চরিত্রই নেই যার তার আবার ধর্ষণ কোথায়?"; "বিশ্বের প্রভু কে সে তো সকলেই জানে", আপ্ত এ জ্ঞানে পরিশ্রুত এদানির ইঙ্গবঙ্গীয় সমাজ—"আজও অকাতরে আপন ভাষায়/... হাঁটু ভেঙে পড়ে থাকে আলপথে গরমে বা শীতে" যারা, সেই অভাগাদের 'পর বর্ষিত হয়, বাংলা ভাষার দুস্থতা সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ, জান্তে বা অজান্তে ঔপনিবেশিক চৈতন্য-কেত্তনে ঊর্ধ্ববাহু, বাংরেজিবাগীশ মধ্যম-বর্গের কৃপাকটাক্ষ, "রক্তে তো ইংরেজি নেই, বাঁচবে কী ভাবে" ('বাবু বলেন', *বাবরের প্রার্থনা*, ১৯৭৬; 'বাবুমশাই', *মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়*, ১৯৭৪; 'স-বিনয় নিবেদন', *মাটিখোঁড়া পুরোনো করোটি*, ২০০৯; 'চরিত্র', *লাইনেই ছিলাম বাবা*, ১৯৯৩; 'রক্তের দোষ', *ছন্দের ভিতরে এত অন্ধকার*, ১৯৯৯)। উপরপাটে বাম-দখিনে অনায়াস কোলাকুলি, গলাগলি; আর তাই, শঙ্খ ঘোষ ন্যায় সুজন দরদিয়ার পক্ষেও,

নিঃসহায়ের বেদনায় অনুক্রোশে শরিকদারি বাধ্যত আংশিক। অপূর্ণতার সে ক্ষোভ বহিঃপ্রকাশে ক্রোধ, ক্রোধসঞ্জাত শ্লেষ ও বিষাদ।

তবে, শ্লেষে-বিষাদে দোলায়মান কবির সঞ্চরণেও ও-দুই মেরুর মাঝবরাবর আছে একান্ত ব্যক্তিক উদ্ধারের সাধআশা— "আমি সমস্ত দিনমান পথে পথে পুড়ে বেড়াই/কিন্তু আমার ভালো লাগে না যদি ঘরে ফিরে না দেখতে পাই/তুমি আছো, তুমি" ('তুমি', *মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়*, ১৯৭৪)। আমি-তুমির কাম্য সম্মিলনে ব্যাঘাত কিন্তু কম নেই, কম নেই অন্তরায়, "একলা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি/তোমার জন্য গলির কোণে/ভাবি আমার মুখ দেখাব/মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে" ('মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে', *মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে*, ১৯৮৪)।

বয়স তখন দুয়ের কোঠায়, ১৯৫১ সালে কোচবিহারে খাদ্যের দাবি-মিছিলে পুলিশ-বুলেটে এক ষোড়শীর নিহত হওয়ার প্রতিক্রিয়ায়, শঙ্খ ঘোষের কলম থেকে ছুটেছিল মায়ের কাছে মেয়ের মর্মপ্রদাহী আবেদন, "নিভন্ত এই চুল্লিতে মা/একটু আগুন দে", ছিল তাতে বিবাহের রূপকে কন্যার "নেকড়ে-ওজর মৃত্যু"-র বর্ণন, "যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুকে দিয়ে/বিষের টোপর নিয়ে" ('যমুনাবতী', *দিনগুলি রাতগুলি*, ১৯৫৬)। পেরোলে চব্বিশ বৎসর, এল ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা গান্ধি উদ্‌ঘোষিত, ১৯৭৫-৭৭ জুড়ে জরুরি অবস্থা, গণতন্ত্রের "সৃষ্টিহরণ" "নির্-বীর্যীকরণ"-এর পালা ('চালচলন', *মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়*, ১৯৭৪)। ১৯৭৬-এ বেরোলে ১৯৭৪-

৭৬ মধ্যে রচিত শঙ্খ ঘোষের *বাবরের প্রার্থনা*। বহু কবিতাই এর বক্রধারে শানানো, এশিয়ার মুক্তিসূর্য নেত্রীর ও তস্য চেলাচামুণ্ডার স্তুতিচ্ছলে ব্যাজস্তুতিতে রাগরঙময়: "হাত তোলো যদি নৃত্যনাট্য/কথা যদি বলো ছন্দ"; "সুন্দরী লো সুন্দরী/কোন্ মুখে তোর গুণ ধরি/দিব্যি সোনার মুখ.../কিন্তু মুখে জ্বলবে আলো/পদ্মাভসংকাশ/নেই কোনো সন্ত্রাস"; "পেটের কাছে উঁচিয়ে আছো ছুরি/কাজেই এখন স্বাধীনমতো ঘুরি"; "নিচু গলায় কথা বলার অপরাধে তার/যাবজ্জীবন/কারাদণ্ড হল/হামলে পড়ল তার ওপর তিনটে ভালুক/ঠিক ভালুক নয়, প্রহরী/...বলল তারা, খবরদার/এদিক-ওদিক তাকাবে না, কেবল গলা খুলে চেঁচাও"; "শব্দ কোরো না/হেসো না বাচ্চা/চুপ/...বাঃ/এবার শান্তি/স্বস্তি এবার/ওঁ!"; "কঠোর বিকল্পের পরিশ্রম নেই" ('দুই মুহূর্ত'; 'মার্চিং সং'; 'আপাতত শান্তিকল্যাণ'; 'শান্তি'; 'শৃঙ্খলা'; 'বিকল্প')। এর অতিরিক্ত, *বাবরের প্রার্থনা*-য় আছে যাত্রীবাহী বাসে শোনা ছেঁড়া-ছেঁড়া উক্তিতে গাঁথা 'কুড়োনো কবিতা'/'found poem', "ভিতরদিকে আছেন যারা/একটু মশাই নড়ুন—/চাপ সৃষ্টি করুন!/চাপ সৃষ্টি করুন!" ('চাপ সৃষ্টি করুন')।

"রক্তে তো ইংরেজি নেই, বাঁচবে কী ভাবে", এ-উদ্বেগেই হয়তো, মূলত ছোটোদের উপভোগ-নিমিত্ত, শঙ্খ ঘোষের *ছড়াসমগ্র*-এর (২০১০) উৎসর্গপত্র এমন বিষণ্ণ: "অল্প বয়সের যেসব ছেলেমেয়ে এখনও বাংলা পড়ে তাদের জন্য"। এরই অন্তর্গত ছড়া-সংকলন সবকিছুতেই খেলনা হয় (১৯৮৭), "অল্পবয়স

কল্পবয়স গল্পবয়স” শ্রোতা-পাঠকের বকবকানিতে এদের মধ্যে একজন আবার অতিরঞ্জনে অতি দড়, বালকটির উলটোপালটো চিত্রদর্শনে এমন-কী ওর প্রিয় মেয়েবন্ধুরও ভরসা নেই—সখেদে নিজের মনেই বিড়বিড়োয় সে, “বলি না তাই সেসব কথা, সামলে থাকি খুব,/কিন্তু সেদিন হয়েছে কী—এম্‌নি বেয়াকুব—/ আকাশপারে আবারও চোখ গিয়েছে আট্‌কে/শরৎমেঘে দেখতে পেলাম রবীন্দ্রনাথকে!” (‘মিথ্যে কথা’)।

কে জানে, অমনতরো কোনো কল্পনাপ্রবণ “বেয়াকুব”-ই ভরা যৌবনে, শরীরের “কোষে কোষে বিদ্যুৎ, বা/কাঁকড়াবিছের ঘা”-য়ে উতল যখন দিবসরাত, মাঁগবে অসময়ের ছুটি; “বুকের ভিতর শুধু ক্ষত দেবে রাত্রির খোয়াই” অনুভবে, রমণ-মরণের উভটানে নেবে পণ, “তাই হব/পঁচিশে বৈশাখ কিংবা বাইশে শ্রাবণে আত্মঘাতী” (‘শরীরমশাই’; ‘আত্মঘাত’; *প্রহরজোড়া ত্রিতাল*, ১৯৮২)।

৮

পঁচিশে বৈশাখ ১৪০৮ [২০০১], পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে, ছাপাখানা থেকে বেরোয় *গ্রন্থপরিচয়*—কাটাকুটিতে মসিকালো যাঁর পাণ্ডুলিপি, একই পাঠের পাঠান্তরে বিরামহীন যিনি, বহুপ্রসূ সেই রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনার সবিশদ, নির্ভুল তথ্যকোষ। কণামাত্র সন্দেহ নেই, প্রত্যেক রবীন্দ্র-ভাবুক, গবেষকের পক্ষে অপরিহার্য গ্রন্থপরিচয়। এর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যসংখ্যা আট; সে তালিকায়, সবার নিচে সবার পিছে, শঙ্খ ঘোষের নামোল্লেখ। অবশ্য, সকলেই অবহিত, গ্রন্থপরিচয় নির্মাণকার্যের

গরিষ্ঠাংশ তাঁরই পরিশ্রমে সংঘটিত। নির্বিবাদ, যে অবধান, যে সতর্কতা *গ্রন্থপরিচয়*-এর গৌরব, তার প্রেরণা, ১৯৬১ সনে তদানীন্তন সরকার স্থাপিত কীর্তিফলক, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*-র 'নির্দেশিকা'। ওই 'নির্দেশিকা'ই শঙ্খ ঘোষের ১৯৭৮-এর নিবন্ধ 'উর্বশীর হাসি'র বিষয়বস্তু—এ কোন্ বিভীষিকা! রবীন্দ্রনাথের *সাহিত্যের পথে*-র একখানি বাক্যের খোসা ছাড়িয়ে স্বতন্ত্র এন্ট্রির মর্যাদায় জ্বলজ্বল করছে সরকারি সূচিতে "মোনালিসার মতোই রহস্যময়" 'উর্বশীর হাসি'; অনবদ্য ও পঞ্জিতে পুঞ্জিত গুনতির বার হাস্যকর সমাচার: *চিরকুমার সভা*, 'ছন্দের মাত্রা', 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত', *জাপানযাত্রী*, *পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি*, *বাংলাভাষা পরিচয়*, মায় *শেষের কবিতা* না-কি বিভিন্ন রবীন্দ্র-কবিতার শীর্ষনাম; রবীন্দ্র-প্রবন্ধের ফর্দে আছে *ব্যঙ্গকৌতুক*, 'জনগণমন অধিনায়ক', *ছিন্নপত্র*; *বিদেশী ফুলের গুচ্ছ*, 'ম্যাকবেথ নাটকের অংশ', 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য' প্রভৃতি না-কি রবীন্দ্রনাথের গোটা-গোটা বই, অথচ, নেই সে লিস্টিতে *বাল্মীকি প্রতিভা*, *চিত্রাঙ্গদা*, *চণ্ডালিকা* বা *শ্যামা* ('উর্বশীর হাসি', *উর্বশীর হাসি*, ১৯৮১)।

কবিতা আছে, ছড়া আছে, চিন্তাগভীর গদ্য আছে, সম্পাদনা আছে, আছে স্মৃতিকথা, গুণমানে অপরিমেয় যেমন তেমনি পরিমাণে প্রচুর শঙ্খ ঘোষের সৃষ্টিসম্ভার। তথাচ, অতিথি-আপ্যায়ন বলো, জমাটি আড্ডা-মজলিশ বলো, অকাতর তাঁর বন্ধুবাৎসল্য; এই সহ আছে অধ্যাপনা, বিদ্যায়তনিক জমায়েতে বক্তৃতা, নানান সভাসমিতিতে সশরীর যোগদান। আমাদের সবিস্ময় জিজ্ঞাসা

ছিল তাই, কখন, কোন্ ফাঁকে, সারেন উনি ওঁর লেখালেখি? সে কি বিনিদ্র বিভাবরীতে?

১৯৯৭ সাল নাগাদ। শুরু হব-হব কিশোর-কিশোরী-সেব্য মহাপুরুষদের নূতন জীবনীমালা; পরিকল্পনাটির নেপথ্য-সঞ্চালক, শঙ্খ ঘোষ। আমার ছিল জোগাড়ের কাজ, বাংলায় অধিকারমন্ত কয়েকজন তরুণ-তরুণীকে তাঁর সমুখে হাজির করা। চার কী পাঁচ ইচ্ছুককে নিয়ে এক সন্ধেয় যাই ওঁর উল্টোডাঙাস্থ 'বিদ্যাসাগর আবাসন'-এর ফ্ল্যাটে। গিয়ে দেখি, শঙ্খবাবুর ছোট্টো বৈঠকখানার কোণে, তক্তায় উপুড়, নৈঃশব্দ্যে নিথর এক প্রৌঢ়, ঘষঘষিয়ে কী-সব লিখে চলেছেন। জ্ঞাত হই অল্পপর, ভদ্রলোক, শঙ্খবাবুর খুল্লতাত—হঠাৎ-বিপত্তির কারণে ভাইপোর শরণার্থী। আলোচনা সেরে আমরা যখন রাস্তায়, আমাদের রসিক এক সঙ্গী কুটুস ক'রে ফুট কাটে, "এতক্ষণ আমরা যার সঙ্গে কথা বললুম, সে লোকটা জালি নয় তো? আর, ওই যিনি অখণ্ড মনোনিবেশে লিখেই যাচ্ছেন, তিনিই কি আসল শঙ্খ ঘোষ?"।

৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২-এ জন্মে, ২১ এপ্রিল ২০২১, কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত, মারা যান শঙ্খ ঘোষ।

করোনা জীবাণুর অনন্তর ভোলবদলে, ঢেউয়ের পর ঢেউ-য়ের ঝাপটায়, বিশ্বগ্রাসী অতিমারি মারাত্মক থেকে মারাত্মকতর। আধ্যাত্মিকতার স্বর্গপুরী ব'লে নন্দিত ভারতের দিগ্‌বিদিক তো মণিকর্ণিকা শ্মশানে পরিকীর্ণ—নগর-গাঁ-গঞ্জে জ্বলে অনির্বাণ চিতা, পুণ্যতোয়া গঙ্গা আজ শববাহিনী, লাশভারে বানভাসি...

মড়কের ব্যাপ্ত এ পটভূমিকায় কী তবে আওড়াব আমরা, কী হবে আমাদের প্রণাদ?

সে কি *নিহিত পাতালছায়া*-র (১৯৬৭) লাইনে আঁকাবাঁকা মিশ্রকলাবৃত্ত, 'পোকা':

খা, খা,
খুঁড়ে-খুঁড়ে সবই অস্থায়ী
খেয়ে যা, খেয়ে যা, খা।

না-কি, *বাবরের প্রার্থনা*-র (১৯৭৬) নামকবিতা, ৭ মাত্রা কলাবৃত্তে প্রলম্বিত স্তব:

ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

ছবি: আসমা বীথি

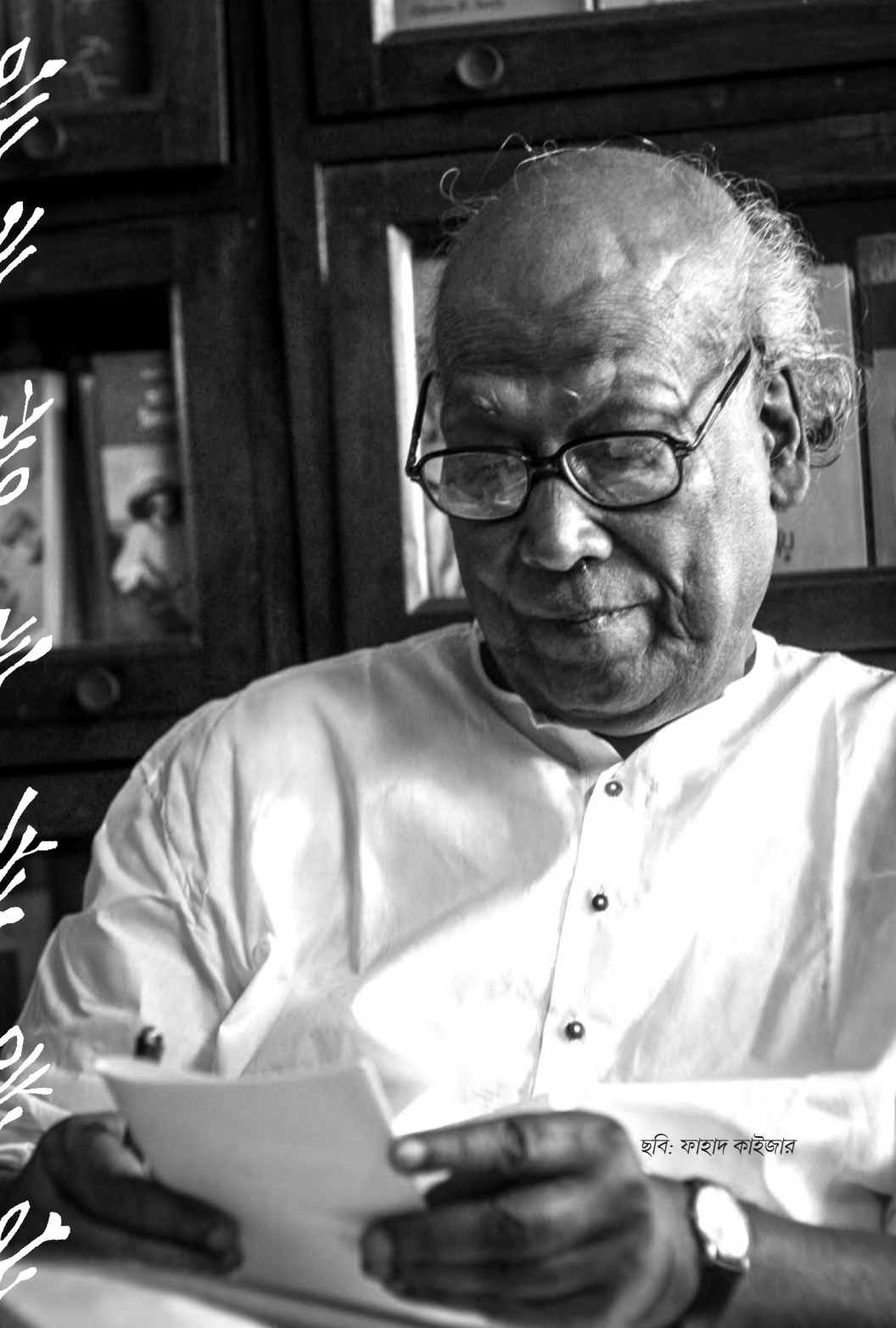

ছবি: ফাহাদ কাইজার

Kumar Shahani

For opening the doors of perception that vibrate to the gentle *bruit* of Bangla, I owe so much to Sibaji and to Sankho-da ! And, before them, to Rabindranath himself.

Here is an excerpt from the book called *A little school / Chotto ekta school* by Sankho Ghosh:

> Isn't there always a bit of excitement at a new teacher's arrival ? . . .
>
> In 1945 . . . with just such excitement we—students of class nine—were awating our new

teacher . . . . When he taught us Bangla he would, without any particular reason, rattle off such lines, that listening to him we felt as though we were entering a new planet.

"Let's see…where is this from? Who is the writer?" And he would recite a few lines of prose from memory: "*Chhander sange a-chhander prabhed hochhe…*'

The difference between *chhanda* and *a-chhanda* is that there is movement in one and the other only speaks but does not move."

Wow! That was something! Who was the writer? What was the source? We didn't have the answers, but it was wonderful to hear. Particularly, because we had never ever heard a word like *a-chhanda*, we found it so engaging.

The teacher looked at defeated us and with a slight smile, he said, "Couldn't get it? It's by Rabindranath, in a book called *Chhanda*. Look it up some time . . ."

Dekhechhilam parey, dekhi aaj'o majhe majhe

I did look it up later, I still do so now and then. I saw that the way I have said the line was not exactly how it was in the book. It went: "*chhander*

sange o-chhander tofat ei je katha ekta-te choley, arekta-tey boley kintu choley na . . . .

The difference between *chhanda* and *a-chhanda* is that there is movement in one and in the other there is only speech but no movement. The one which moves sometimes plays, sometimes dances, sometimes fights, laughs, weeps; the one that sits still, runs offices, argues and gets into groupism."

*

Yes, it was Rabindranath alone that I knew as écriture, scripture and as recitative in more than one language! Just as my mother knew the *shabad*, Guru Nanak, *the Granth Sahib*. That was the beginning and then there was the Partition. So catastrophic that people had to seek a nation, even accept the deceptive identities imposed by the Modern State, coercive nativisms that straitjacketed languages, costumes and cuisine into crusading militant religiosity, essentialist to the extreme.

Be-dar-o deewar sa ik ghar banaya chahiye

The struggle for independence had to continue, as in Ritwik-da's films. In fact, it had to deepen, reach out, spread into the hearts, minds, the very truth of existence.

The fifteenth of August 1947 was the highpoint of several millenia of human aspiration. Our tryst with destiny was also the point of departure which demanded a new *sanchalan*, like the sorties of aircraft touching down frequently, aiming to fly into the stratosphere.

I think only the poets sense those thoughts and emotions, mental events, with a heightened intensity. As all around us on this scorched earth, the shadows of birds in flight floating between night and day in the twilight of sealed memories of consummation flutter within . . .

দিন আর রাত্রির মাঝখানে পাখিওড়া ছায়া
মাঝে মাঝে মনে পড়ে আমাদের শেষ দেখাশোনা।

The residual micro-tones change every morning and evening of the six seasons, creating new synecdoches in the stillness of empty spaces condensed into palettes of a single note. These were the notes illuminated by Rimli Bhattacharya, as she translated *Char Adhyay* to me, elaborating the resonances of each sentence, written originally with the kind of effulgence of zamzam springing forth in a distant desert.

*

Meanwhile, a student of mine, Nandini Sanyal had said—almost as a challenge—that I should not dare to make *Char Adhyay*, specially in Hindi:

> "How would you even say '*tomar chokhe dekhechhilam aamaar shorbonash*'?"

Distinguished colleagues echoed her sentiments, some in public, some in private. But, it was Nandini who played a 33 rpm record for me, with contemporary poets reciting Tagore . . .

Suddenly, on that warm winter afternoon, we found the voice that could enunciate our literature with a life-giving lilt that knew no borders, overflow beyond the fiftieth year celebration of our independence and the centenary of cinema: Sankho Ghosh.

The person who actually brought me to sense Sankho-da's *pran* in his poetry, simultaneously linking him to the undulating rhythms rhymes and deeper resonances was—and is—Sibaji Bandyopadhyay, a Gramscian intellectual who goes beyond the limits of organicity that were imposed upon Italian modes by the predecessor Benedetto Croce.

For *Char Adhyay*, I wished to bring forth the overtones of the *bhikshu* Rabindranath in the utterance

of contemporary speech and Sankho-da's perilious *andolit* notes. And Sibaji helped me get there, honing in on the poems, stitching them seamlessly. . .

Sibaji's is a roaming restless mind opening up the *chhanda* of every language, as he rightly believes that for every *ghar* there is a *bahir* and then, the mental space of the verandah.

*

What is that verandah like?

It is the transient vocal fold creating the envelope of *vyanjana*. It is the freedom to move between the argot of our times and those recesses of the past that light up the subjunctives of the future. It is where the *parans* themselves inhabit the precipices of melody. They rock the cradles. Nurture the imaginary with insights, show us the paths ahead. Five notes of a *raga* or even three in *aroha* and *avroha* predict the future differently every time you approach each one of them.

Are these diffractions from the darkness of basalt in the caves? Or refractions that graduated to other scales from rock roofs as they changed to domes as sensitive as the interstices of textile?

All this was present in the text of *Char Adhyay* in the manner that Rimli read the signs to me, glossed the words in a soothing cadence.

I had heard it read in other voices, both randomly chosen ones and those that were doctored by professional and political engagement. All the recordings were passed on to the poet Udayan Vajpeyi who had then to bring the sense across as lyric and prose in a gradient from the tragic to the everyday in the Hindi dialogue. He looked at the transcriptions of the original even as he heard the different voices give breath to the same text in Bangla. It was the breath that had to exchange the mystery of both languages. It had to have that oscillating layer between *swabava* and *swatantrata*, thereby meeting the ethical confluence of the four *purusharthas*.

*

Sibaji had acted as an advisor to me in a workshop I did on 'Ratri'. It is he who recited lines from Jibananda Das over the tramlines in our *Char Adhyay*. So when he had given me Sankho-da's phone number to work out a new relationship with the most refined inheritor of Tagore's literary legacy, I felt elated.

৫৫

But, when I heard Sankha-da's voice over the telephone, I was assailed by Bressonian questions, even as he graciously invited Sibaji and me to his home.

For Bresson, the voice over the telephone had to be the introductory act of revelation. It was not the syntax or the content that was of great importance. And certainly, it was not the manner in which the language was spoken. In any of those four notes where speech is consonant before the poetry turns into song, our voices differ individually with all the greatest variations of *sattva*, *rajasva* and the *tamasik*, what lies beneath and above the spectrum.

Every sound—that is sifted through the finest valves and filters, the natural sieves—begins to float in transient microtonal forms beyond the clouds of incalculable variance. In those partials of whole tones there is a return to us of desire, memory, exchange of insight or just a hint of the ineffable at the threshold.

The timbre distinguishes itself, in *shruti*, *swara*, attentive evocations of the imaginary simultaneously there and not quite there. All *deieses* and *murchhanas* conducted in potential *riyaz* (such as that of great composers) as different forms of energy belong to future particularisations of moments that reason does not know. For the heart has its own reasons.

These very qualities are now available to synthesisers that have appropriated the composite tones and overtines of the *hemraj tanpura*.

Numerated simulators have even taken over the chroma.

*

Will Sankho-da agree to dissimulate?

Will he willingly abandon his social being to that other which has no name, no number, but which can be sourced in the vibrations immanent in the bodies' disturbances, simultaneously within and without, recovered from the silences in between and colours brightened by the darkness all around:

আসবে যদি শূন্য হাতে—
আমি তাইতে কি ভয় মানি!
জানি জানি, বন্ধু, জানি—
তোমার আছে তো হাতখানি॥

আঁধার থাকুক দিকে দিকে আকাশ-অন্ধ-করা,
তোমার পরশ থাকুক আমার-হৃদয়-ভরা।

তুমি ব্যাপ্ত করো আর্দ্র হাত
এসো, সব সাজ খুলে ফেলি,

দুই হাতে আপন্ন সংসার
নিয়ে চলো ঘরে।

জীবনদোলায় দুলে দুলে আপনারে ছিলেম ভুলে,
এখন জীবন মরণ দু দিক দিয়ে নেবে আমায় টানি॥

Divinity perhaps is to be found in the *deiesis* of speech.

Perhaps of tone, colour, other dimensions in fractal composites?

Delhi, 14 June 2021

Endnotes

1. Kumar Shahani's *Char Adhyay* (1997) (Hindi and Bangla). *35mm*, *Feature*. NFDC, Mumbai, India.
2. Sankho Ghosh, 'Notun mastermoshai' in *Chhotto Ekta School*, Kolkata, Sishu Sahitya Samsad, 1998, pp. 28, 30.
3. Mirza Ghalib, *Be-dar-o deewar sa ik ghar banaya chahiye/make a home without doors or walls*
From the shair: "*rahiye ab aisi jagah chal kar jahaan koi na ho*"
4. Sankha Ghosh, 'Jouban' in *Adim Latagulmamoi* (1972)
5. The poem with which the essay closes is an amalgam of a part of the Tagore-song 'Aaji bijon ghare' (1918) and a few lines from Sankha Ghosh's poem 'Bhumadhyasagar', *Tumi to Temon Gouri Nou* (1978).

A rough translation:
If you come with empty hands—
Will that make me anxious!
I know, don't I know, friend—
Still there are your hands.

Let there be darkness, sky-blinding,
But let your touch be there, heart-filling.

Spread out your damp hands
Come let us strip ourselves of all coverings,
Holding the disturbed universe in your two hands
Take me homewards.

Swinging ceaselessly in the swing of life I had forgotten myself,
Now life and death will pull me from two ends.

ভবেশ দাশ

আরোগ্য পথের ইশারা

জীবনপ্রান্তে এসে একটি সমাজ-সাহিত্যপত্রের সম্পাদনা-ভার নিতে হয়েছিল দেবেশ রায়কে। পত্রিকাটির নাম 'সেতুবন্ধন'। তারই প্রথম সংখ্যায় (মে, ১৯৯৭) তিনি প্রকাশ করেন কবি শঙ্খ ঘোষের জ্ঞানপীঠ পুরস্কার গ্রহণের অভিভাষণ। প্রথমে ধারণা ছিল, এই সম্মাননা-সভায় কবির বলার জন্য সময় পাওয়া যাবে সাত-আট মিনিট। পরে অনুষ্ঠানের সূচি অনুযায়ী সময় কমে যায়, কার্যত সাড়ে চার-পাঁচ মিনিট। কবি তখনই সংক্ষিপ্ত করে নেন তাঁর বক্তব্য। এতে তাঁর মূল ভাষণের বিশেষ হানি না হলেও,

শঙ্খ ঘোষ ৭৬

বক্তব্য-অনুসারী তাঁর নিজেরই একটি কবিতা যে পড়ার ইচ্ছে ছিল, তা আর হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু চার বছর আগে সেদিন কবি কী বলেছিলেন সেই সম্মাননামঞ্চে দাঁড়িয়ে? সবিনয়ে বলেছিলেন, তাঁর যোগ্যতার অতিরিক্ত এ সম্মান। 'সমগ্র ভারতের কথা যদি বাদও দিই, এমনকি বাংলাতেও গদ্য এবং কাব্যে এমন লেখক আছেন, যাঁরা আমার চাইতেও অনেক বড় লেখক ও এই ধরণের সম্মান পাবার পক্ষে অনেক বেশি যোগ্য। তাই আমি বলছি, আমি যখন এই সম্মান গ্রহণ করছি, তখন আমার নিজের পক্ষ থেকে গ্রহণ করছি না। আমি গ্রহণ করছি বাংলা সাহিত্যে আজ যারা সৃষ্টিশীল কাজেরত আছেন তাঁদের পক্ষ থেকে।' — তাঁর এমন বিনীত কুণ্ঠার কথা আমরা জানি। কোনো পুরস্কার বা সম্মানপ্রাপ্তি নিয়ে তিনি বিশেষ কোনো কথাই কোনোদিন বলতে চাননি, এমনকি মিডিয়া থেকে শতহস্ত দূরে থেকেছেন, সে কথাও আমাদের জানা।

তবু এইটুকুই তো শুধু নয়, সেদিনের সভায় আর কী বলেছিলেন কবি? যে-সময়ে দাঁড়িয়ে তিনি নিচ্ছেন এই পুরস্কার, সেই সময়ের কি কোনো ছায়াপাত ঘটেনি, তাঁর ভাষণে?— সেবার বাংলা সাহিত্যে জ্ঞানপীঠ পাবার ঘটনা প্রায় দু-দশক পর। তারই সূত্র টেনে তিনি বললেন, 'অন্তবর্তী এই দু-দশকে আমরা যে দীর্ঘপথ এলাম, তা খুব গৌরবজনক নয়। কোনো লেখকের পক্ষে এ-বিষয়ে অচেতন থাকা সম্ভব নয় যে আমরা উগ্র ও আক্রমণমুখী এক সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। আমরা লক্ষ করছি উৎকট ও মারমুখো সারাটা দেশে আমাদের কথা বলবার ও

মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর ধারাবাহিক, পরিকল্পিত ও কখনো কখনো বর্বর আক্রমণ ঘটেছে, বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষ মতামত ও আচরণের ওপর। সব কিছু দেখে মনে হচ্ছে, জ্ঞানত কিংবা অজ্ঞানত আমরা অত্যন্ত নিশ্চিত ও দৃঢ়ভাবে এক অন্ধকার ও ভয়ংকর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছি। প্রত্যেক লেখককে, বস্তুত প্রত্যেক নাগরিককেই এই বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে তাঁদের শক্তি নিয়ে, চরম সর্বনাশকে প্রতিহত করার জন্য।'—বলতে গেলে প্রায় এক রাষ্ট্রীয় সভামঞ্চে দাঁড়িয়েই এই ছিল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁর সময়োচিত আহ্বান।।

ঋজু ভঙ্গিতে এই কথাগুলো বলতে গিয়ে তিনি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র সেই কথাটা মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ থাকে না। মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যেন কোনোভাবেই স্তব্ধ না হয়ে যায়, সেজন্য মনে করিয়ে দেন বিষ্ণু দে-র কথা: 'জেনো, হয়ে গেছে বহু দেরি'। সুতরাং সর্বনাশকে প্রতিহত করার কাজ করতে হবে আরও তৎপরতায়। ঘনিয়ে ওঠা অন্ধকারের ছবি দেখেই যে হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে যেতে হবে, এমন কোনো ইঙ্গিত তিনি দিতে চাননি বলেই তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল বেরটোল্ট ব্রেখট-এর সবচেয়ে ছোট্ট কবিতার লাইন: 'দিনগুলি যখন অন্ধকার হবে/ তখনও কি আর থাকবে না কোনো গান?' অবশ্যই থাকবে, তখন অন্ধকারকে নিয়েই গান লেখা হবে। সেই অন্ধকার ছিঁড়ে নিয়ে আসতে হবে আলো। সেই আলোর স্বপ্ন দেখাতে তিনি এমন দেশের ছবি নিয়ে আসেন, 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির, জ্ঞান যেথা মুক্ত'।

আমরা যদি দেশের এখনকার অন্ধকারময় অস্থিরতার কথা ভাবি, তবে কি মনে হয় না, এর চাইতে, একজন কবির অনিবার্য সংগত ভাষণ আর কী হতে পারত? তাঁর সম্মান-পুরস্কার সবকিছু ছাপিয়ে দেশের অন্ধকার-মুক্তির প্রার্থনা ছাড়া আর কোন বায়বীয় কল্পলোকের কথা ভাবতে পারতেন তিনি? নিঃশব্দের তর্জনী তোলা কবির তো পুরস্কারের ঝোঁকে কোনো বিগলিত প্রগল্‌ভতা মানায়। আর প্রগল্‌ভতার সঙ্গে তো তাঁর সহজাত বিরোধ।। কিন্তু এই ভাষণের সঙ্গে কবি তাঁর একটি কবিতাও পড়তে চেয়েছিলেন। কী সেই কবিতাটি? কী ছিল তার মর্মছবি?— কবিতাটির কোনো শিরোনাম নেই। *গন্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ*-এর ২৫ নম্বর কবিতা। এই বইয়ের অধিকাংশ সব কবিতাই লেখা হয়েছিল শিমলার এক পাহাড়-চুড়োয়। 'মেঘকুয়াশায় চরাচর ঢেকে দেওয়া, সেখানকার এক সকালবেলায় অনেকদিন পর একেবারে একঝোঁকে লেখা' হয়েছিল কয়েকটি কবিতা। কবির মনে হয়েছিল, 'কয়েকটি' নয়, সব মিলিয়ে একটিই মাত্র লেখা, কেবল স্তরে স্তরে খোলা। তারই একটি স্তরকে তিনি সম্ভবত পড়তে চেয়েছিলেন, সেই সম্মাননা-সভায়।

গত শতাব্দীর আশির দশকের শেষে দিকে (যার বছর চারেক পরেই ভাঙা হবে বাবরি মসজিদ) এই কবিতাটিতে মোঘল সম্রাট আকবর তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হিন্দু সভাসদদের অন্যতম টোডরমলকে কিছু কথা বলেন। কী বলেন:

> এই রাত্রি, টোডরমল, ভেসে আছে আতুর আলোয়
> আকাশ আভাসমাত্র, স্থল জল বাষ্প হয়ে আছে
> শূন্যের পূর্ণতা নিয়ে ভরে আছে ইবাদতখানা—

এই রাত্রে মনে হয় স্বপ্ন দেখলে দোষ নেই কোনো।
একদিন এই দেশে— সুজলা সুফলা এই দেশে
পাথরে পাথর গেঁথে উঁচু করে বানাব মিনার
সেখানে দাঁড়িয়ে যারা ছিন্নভিন্ন পক্ষাঘাত থেকে
চন্দ্রগরিমার দিকে বাড়াবে অশোক হাতগুলি
তারা কেউ এরা নয়— হিন্দুও না, মুসলমানও নয়,
জৈন বৌদ্ধ খ্রিস্টানও না, জরথুষ্ট্রি নয়, কিন্তু সবই
একাকার কোনো দীন ইলাহির গোলাপবাগানে
উৎসের আতর ছুঁয়ে প্রাচী-র প্রান্তর ভরে দেবে।
আর এই ফতেপুর—ফতেপুর সিক্রি যার নাম
তারই মর্মমূল থেকে এ জাহান পেয়ে যাবে নূর—
তখন কোথায় আমি, কোথায়-বা ক্ষত্রবংশী তুমি
মানুষই তখন গান, মানুষই তখন ব্রুবাদুর।

ভাষণ ইংরেজিতে দিলেও এই কবিতাটি প্রথমে বাংলায়, পরে ইংরেজি অনুবাদটি পড়ার ভাবনা ছিল। কিন্তু নিজের এই কবিতাটাই পড়া যায়নি। কবিতাটি লেখার প্রায় তিন দশক পরে এইরকম একটা অনুষ্ঠানে তা পড়ার জন্য তিনি নির্বাচন করেছিলেন কেন? কবিতাটির বেশিরকম প্রাসঙ্গিকতা তিনি কোথাও অনুভব করেছিলেন। দীর্ঘ ভাষণের বিকল্পে যা হয়ে উঠতে পারত এক সংহত গভীর প্রতিবেদন।

২০১৭-তে কবি যখন এই জ্ঞানপীঠ পুরস্কার গ্রহণ করেছিলেন, সেই সময়ে দেশের কোন সংকট তাঁকে বেশিরকম ভাবাচ্ছিল? যে-কথা সেদিন তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণেই বলেছেন, যেমন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর পরিকল্পিত আঘাতের কথা, তার থেকে বেরিয়ে এক স্বপ্নপূরণের আকাঙ্ক্ষাতেই এক প্রতিমার রূপ নিয়েছে এই

কবিতা। সম্রাটের আসনে বসেও আকবর তাঁর সভাসদদের অন্যতম টোডরমলকে এক মিনার বানাবার স্বপ্ন দেখান, যেখানে উগ্র ধর্মপরিচয়হীন মানুষ, শুধুমাত্র মানুষ পরিচয়ের গরিমা নিয়ে আকাশের দিকে তুলবে তাদের সমবেত যূথবদ্ধ হাত। তখন ফতেপুর সিক্রির মর্মমূল থেকেই এই বিশ্ব নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। তখনই তো মানুষের শরীর-মন জুড়ে ধ্বনিত হবে গান আর দেখা দেবে ধ্রুবাদুরের মতো গীতি-কবিতার মহিমা।

'এক ঝোঁকে' বেশ কয়েকটি কবিতা লেখা হলেও, এই স্রোতে মিশে ছিল আগে ও পরে লেখা আরও কিছু কবিতা। সব নিয়েই সংকলিত *গান্ধব কবিতাগুচ্ছ*-য় যা আছে তা নিতান্তই 'পাহাড়চুড়োয় মেঘকুয়াশায় চরাচর ঢেকে-দেওয়া' দৃশ্য-মুগ্ধতার কোনো বিলাস নয়। এখানেও আছে জেগে থাকার ধর্মপালন। সর্বনাশ দিয়ে সর্বনাশ' বাঁচানো, 'হাত ছুঁতে গিয়ে শুধু আগুন' ছোঁয়ার মতো স্বীকারোক্তি যেমন আছে, তেমনই (৩৫ নম্বর) অন্তর্গত স্বরে আছে:

> আজ সবই ভুলে যাওয়া, আজ ধানশিষে লাগে হাওয়া
> বহু বিফলতা আজ এনেছে তোমার কাছাকাছি—
> নিথর ধমনী নিয়ে দুমুহূর্ত বাকি আছে জেনে
> গন্ধর্ব আমরা আজ সমস্ত উড়িয়ে এসো বাঁচি।

প্রাত্যহিকের যন্ত্রণা ও জীবনসংকট যেন খুঁজে ফেরে মুক্তির প্রার্থনালিপি। কখনো গূঢ় সকরুণ জিজ্ঞাসা, কখনো-বা অনুচ্চ মিনতি দিয়ে শূন্য পাত্র ভরে নেবার অনন্ত পিপাসা। তার ভরকেন্দ্রে শুধু বিপন্ন দগ্ধ মানুষ।

যেসব মানুষ নেই যেসব মানুষ মরে গেছে
যেসব মানুষ তবু কথা বলেছিল একদিন
দ্বাদশীর রাতে তারা আমার বাঁকের কাছে এসে
সরাসরি প্রশ্ন করে: বলো কাকে বলে বহমান।

এমনকি 'যেসব মানুষ আজও কষ্ট পায়, যেসব মানুষ/ শুধু বেঁচে আছে বলে মরে যেতে চায় বারে বারে/ ... তাদের সবার শিরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘোলা স্রোতে/ সকালবেলার বিষ' কবি রোজ ছুঁয়ে যান ঠোঁটে। *গান্ধব কবিতাগুচ্ছ*-এর যে-কবিতাটি (২৫ নম্বর) কবি পড়তে চেয়েছিলেন ওই সম্মাননা-সভায়, এইটে ঠিক তার আগের ২৪ নম্বর কবিতা। —এইরকম স্তরে স্তরে খুলে দিয়েছেন মানুষকে নিয়ে তাঁর নিঃশব্দ বিস্ফোরক লিপি।

২

দেবেশ রায়ের 'সেতুবন্ধন' পত্রিকায় পরে অন্যান্য সংখ্যায় আরও কয়েকটি কবিতা লিখতে হয়েছিল শঙ্খ ঘোষকে। তার মধ্যে দুটি কবিতা আলোড়ন তুলেছিল খুব। পত্রিকাই যেন বেশি পরিচিত হয়েছিল সেইসব কবিতার আকর্ষণে। অনেক বেশি প্রত্যক্ষতায় ধরা দিয়েছিলেন কবি। আবার একই সঙ্গে সময়চিহ্নকে করেছেন সময়োত্তীর্ণ। এর একটি 'তিস্‌রা ঝাঁকি' এবং অন্যটি 'মুক্ত গণতন্ত্র'। পত্রিকার আগের সংখ্যায় (২০১৭) 'তিস্‌রা ঝাঁকি'-তে কী লিখে-ছিলেন তিনি?

পঁচিশ বছর আগে উঠেছিল এই সোর —
'ইয়ে তো পহেলা ঝাঁকি হ্যায়'
দুসরা ঝাঁকি ছিল বুঝি গুজরাতের অন্ধকারে
মুছে দেওয়া ন্যায়-অন্যায়।

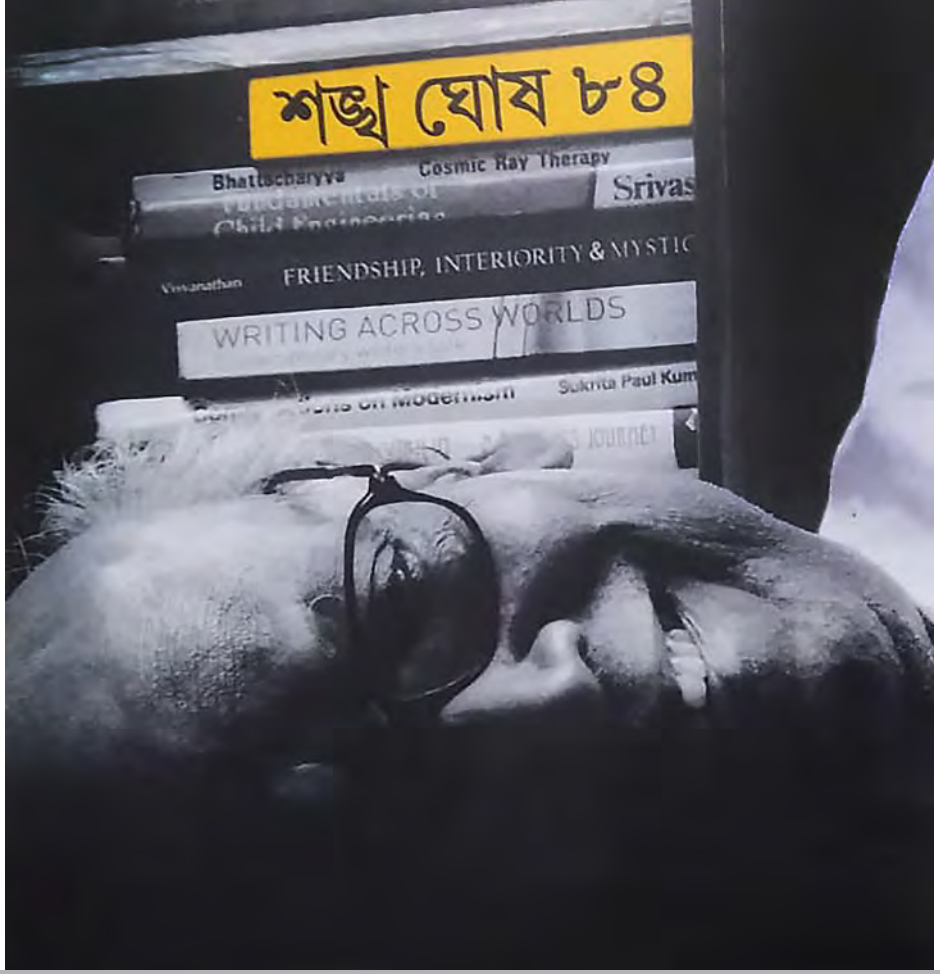
শঙ্খ ঘোষ ৮৪
Cosmic Ray Therapy
FRIENDSHIP, INTERIORITY & MYSTIC
WRITING ACROSS WORLDS

আজ মনে হয় যেন সত্তর বছর পর
ঠিক-ঠিক সবাই স্বাধীন —
গরিবি কোথাও নেই, ভুখা নেই কোনোখানে
সামনে শুধু স্বচ্ছ আচ্ছে দিন।
তিসরা ঝাঁকি দিকে দিকে, কোনোখানে
কালবুর্গি কোথাও-বা গৌরী লঙ্কেশের
খরা জরা জলস্রোতে রক্তস্রোতে ভেসে যায়
স্বপ্ন যত ভবিষ্য দেশের।
গলায় মুণ্ডুর মালা তাথৈ তাথৈ নাচে
গোটা দেশ হয়েছে ভাস্বর —
আজ সে - পরীক্ষা হবে আমরা শুধু শববাহক
না কি কোনো সত্যভাষী স্বর!

'পহেলা ঝাঁকি' ছিল বাবরি-মসজিদ ধবংস। আর পরের দুটি ঝাঁকি স্পষ্টই করে দিয়েছেন কবি। আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে যায়, কেন তিনি জ্ঞানপীঠের সম্বর্ধনা-সভায় পড়ার জন্য গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ এর ২৫ নম্বর কবিতাটিই নির্বাচন করেছিলেন।

অনেকদিন ধরে নানা সময়েই আমরা এই কবিকে একটি নির্দিষ্ট বিশেষণে চিহ্নিত করে তৃপ্তি পাই, তিনি আমাদের বিবেক। এই অভিধাও তাঁর জন্য নিশ্চয়ই এক মর্যাদার আসন। কিন্তু যে-বিশ্বাসে তাঁকে এমন করে ভাবতে চাই, সেই বিশ্বাসকে আমরা মর্যাদা দিই কতখানি? 'বিবেক' বলতে তো আমরা ভাবতে চাই বাধাবন্ধহীন এক মুক্তবুদ্ধি আর মুক্তচিন্তার মন। সেই মনেরই কাছে সমর্পণে আমরা একরকমের শান্তি খুঁজি, কারণ আমাদের মনের আগল খুলে দেয় তাঁর উচ্চারণ। কবি যেন 'প্রশ্নভরা মন, বেদনাভরা হৃদয় আর বিস্ময়ভরা চোখ' নিয়ে আমাদের সামনে

এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি প্রশ্ন করতে করতে পথ চলেছেন, আমরাও চলেছি সঙ্গে। কিন্তু চলেছি, চলছি কি সবসময়ে? —*এই শহরের রাখাল*-এর ভূমিকায় তিনি যেমন করে বলেছেন, তাই-ই এখানে অনুসরণ করছি আমাদেরই প্রয়োজনে। তিনি যে 'জীবনের মধ্যে আরেকটা জীবন, মৃত্যুর মধ্যে আরেকটা মৃত্যুর রূপ' জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন আমাদের মধ্যে, সেই জাগরণ ঘটেছে ঘটছে কতখানি?— ওই যে সুধীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত করে বলছেন, 'আজ হলে প্রলয় বন্ধ থাকে না', বিষ্ণু দে উদ্ধৃত করে বলছেন 'জেনো, হয়ে গেছে বহু দেরি'—সেই সতর্কতার কথা কতটা মনে রেখে চলছি? নইলে তো ব্রেখট-এর নাটকের সংলাপ অনুকরণ করে বলতে হয়, 'দুর্ভাগা সেই দেশ, যে-দেশের কেবলই একজন বিবেকের প্রয়োজন হয়!' বিবেক হিসেবে একজনকে আশ্রয় করতে গিয়ে অনেক সময়ে একান্ত অতি নির্ভরতার একটা ঝোঁক তৈরি হতে চায়। ফলে বিবেক হিসেবে যাঁকে মানছি, হয়তো তাঁর চিন্তা ও প্রয়োগের ক্ষেত্র থেকে অজ্ঞানতই নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখছি। এতে হয়তো ওই বিবেকের প্রতি মান্যতা প্রদর্শনের ওপর একরকমের শৌখিনতার আস্তরণ পড়ে। আগেই বলেছি, কোনো এক সময়চিহ্নকে ধরে কবিতার মুহূর্ত তৈরি হলেও কবি কিন্তু দ্যোতনার অভিসারে সেই সময়কে পার করে দিতে পারেন। মনে পড়বে আজ অনেকেরই বছর তিনেক আগে কবি যখন লিখলেন, 'মুক্ত গণতন্ত্র' কবিতাটি, তখন কীরকম আলোড়িত হয়েছিল পাঠক-মহল। রাজনৈতিক বিরূপতায়ও বিদ্ধ হলেন কবি। যে-কবিতার একটি স্তবক আজও বেশিরকম উচ্চারিত হয়: 'দেখ খুলে তোর তিন নয়ন/ রাস্তা জুড়ে খড়্গ হাতে। দাঁড়িয়ে

আছে উন্নয়ন।'—সেই বিতর্কমুখর উত্তেজনার মাঝে একজন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিককে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বলতে শুনেছি, উনি এসব রাজনীতির মধ্যে না গেলেই পারতেন। কিন্তু সময় সমাজ ও মানুষকে ভুলে গিয়ে আলতো হাওয়ায় খুশির পাল তুলে দেওয়ার কবি তো তিনি ছিলেন না। এই কবিতারই শেষ স্তবকটা যদি আলাদা করে তুলে দিই, যেখানে আছে, 'সবাই আমায় কর্ তোয়াজ—/ ছড়িয়ে যাবে দিগ্‌বিদিকে/ মুক্ত গণতন্ত্র আজ।' — এমন স্তবক যখন পেয়ে যাই তখন কবিতাটি কি কোনো মুহূর্তবন্দি হয়ে থাকে? আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতা বা ভবিষ্যতের দুঃস্বপ্নও কি জড়িয়ে থাকে না? স্তাবকতার গণতন্ত্র কি আমরা দেখতে পাই না? এখনও?

একটা কবিতা পেয়ে অথবা গদ্যের কয়েক টুকরো পড়ে চমক লাগলেও, তার মর্মতলে থাকে কর্মের আহ্বান, তার কতটা ভিতর থেকে গ্রহণ করি আমরা? শিমলার পাহাড়ে বসে যখন শঙ্খ *গান্ধর্ব*-এর কবিতাগুলি লিখছেন, ওই সময়ে তাঁর হঠাৎই মনে হয়েছিল, ইকবাল অনুবাদের কথা। এর অবশ্যই বড়ো কারণ চোখের সামনে বিচ্ছিন্নতা, সাম্প্রদায়িক সংকটে জর্জরিত দেশের ছবি আর রবীন্দ্রনাথে তাঁর পরম আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথ যদি 'পুরাণ বা উপনিষদের নানা শ্লোকে আশ্রয় খোঁজেন বারেবারে' তাহলে ইকবাল কেন কোরানের মধ্য থেকে আনতে পারবেন না সমাধান-সূত্র? *জাভেদনামা* বা 'শাশ্বতগাথা'য় ইকবাল তো বলেইছিলেন:

> কোরান কাকে বলে? সে হলো ধনিকের মৃত্যুপরোয়ানা, আর
> অন্নহারা যারা, সর্বহারা দাস, কোরান আশ্রয় তার।

সূচিপত্র

আমরা যে সেখানে সকলে একাসনে বসে রুটি জল খাই
আমরা আদমের বংশধর যারা, সবার এক আত্মাই।

মনের ভিতরে তা পৌঁছে যায় যদি, বদল হয়ে যায় মনে
বদল হলে মনে গোটা এ পৃথিবী সে মাতায় পরিবর্তনে।

কোরান অধিগত করে ইকবাল যদি বলতে পারেন এ-কথা, তবে সেইকথা ছড়িয়ে দেবার জন্যই তো তাঁর এই 'শাশ্বতগাথা' অনুবাদ করা শঙ্খর সবচেয়ে দরকারি মনে হয়েছিল। দীর্ঘ সময় ধরে করা এই অনুবাদের কাজ তাই তিনি যাচাই করে নিয়েছেন নানাভাবে, বুঝে নিয়েছেন তার বিচ্যুতিহীন যথার্থতা। এ হল সেই ইকবাল, যাকে শুনতে হয়েছে, গোঁড়া মুসলিমদের কাছে তিনি কাফের, আর কাফের ভেবেছে তিনি নিছক মুসলমান।

জাভেদনামা অনুবাদ প্রসঙ্গেই নানা কথার ফাঁকে কবি একবার আমাকে বলেছিলেন একটি ঘটনার কথা। বাংলাদেশে একবার মুসলিমদের একটি সংগঠন এই অনুবাদ কাজের জন্য কবিকে সম্বর্ধনা দেয়। প্রায় ঘরোয়া সেই সভায় তিনি বুঝে নিতে চান আয়োজকদের কাছে যে এই অনুবাদের মর্ম তাঁদের কাছে কীভাবে পৌঁছেছে। বুঝে নিতে চাইছেলেন, যে-ইকবাল 'সূর্যে দেবত্ব আরোপ করেছেন তাঁর কবিতায়, প্রার্থনা আছে সূর্যের কাছে'রামের মতো হিন্দু অবতারকেও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন কখনো', *জাভেদনামা*-য় শ্রদ্ধার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন বিশ্বামিত্র বা গৌতম বুদ্ধের, 'খ্রিস্টসাধনার সত্য থেকে ভ্রষ্ট' খ্রিস্টানদের যে ধিক্কার দিয়েছেন যিনি— সেই ইকবালকে মনে রেখেছেন তো আয়োজকরা? ইকবাল যে

‘ধর্মকে ছুঁতে চেয়েছিলেন জীবনকেই সুস্থতর করবার স্বপ্নে’—অনুবাদকার্যে সম্মান জানাবার আগে সে-কথাও মনে রেখেছেন তো তারা?

আমাদের এক বন্ধু বলেছিলেন, শঙ্খ ঘোষ তো করেছেন ইকবাল-এর *জাভেদনামা*-র অনুবাদ, কিন্তু বইটার নাম ‘ইকবাল থেকে কেন?—অনুবাদক-কবি কী উত্তর দিতেন জানি না। পড়তে গিয়ে মনে হয়েছে, নিতান্তই অনুবাদের ঝোঁকে এই অনুবাদ নয়। আমাদের জীবনবোধের সংকটের মাঝে যখন তিনি এই কাজটাকে একান্ত জরুরি একটা কর্তব্য বলে মনে করেছেন, ধর্মপরিচয়ের উগ্র অন্ধকার থেকে তিনি ইকবালের হাত ধরে আমাদের আলোয় আনতে চাইছেন, দেখাতে চাইছেন কোথায় আছে আরোগ্যপথের ইশারা। কীভাবে দেখাচ্ছেন সে-তো আমরা অনুবাদটা পড়লেই জানতে পারব, কিন্তু কূটধর্মের খোলসের বাইরে বেরিয়ে কে দেখাচ্ছেন সেই পথ—তার ওপরেই নিশ্চয়ই জোর দিতে চেয়েছেন শঙ্খ ঘোষ। বইয়ের মলাটে ইকবাল নামটার উপরেই হয়তো তিনি এভাবে জোর দিতে চেয়েছেন। কোনো কোনো সময়ে মনে হয়, শুধু এই বই-ই নয়, সাধারণভাবেই তাঁর বইগুলির নামকরণের ভাবকল্প এবং রূপকল্প নিয়েই আমরা সহজেই কথা বলার পরিসর তৈরি করে নিতে পারি। ইকবাল কেন—এ নিবন্ধটির শেষ বাক্যটি পড়ে নিলেই তো আমরা বুঝে নিতে পারি, কেন এই নাম: ‘আমাদের নিজেদেরই স্বপ্নচরিতার্থতার পথগুলিকে নির্ভুল করবার গরজে অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে ইকবালকেও আমরা বুঝতে চাই আজ’।

৩

বুঝতে তো চাই, কিন্তু পারি কি? কীরকম যে সব এলোমেলো দিশেহারা দিগ্‌ভ্রষ্ট হয়ে যায়, তারই প্রমাণ ছড়িয়ে থাকে প্রাত্যহিক যাপনপথে। নিত্যদিন আমার যেমন অনাচার দুরাচারের মধ্যে থাকি, তেমন প্রায়শই মিডিয়া ছুটে গেছে তাঁর কাছে। ঘটে যাওয়া অঘটন বা দুর্ঘটনায় তাঁর প্রতিক্রিয়া চাই তাদের। সেখানের হয়তো 'বিবেক'-এর আসনটি দেওয়ার জন্যই তাঁর মতটি জানা অনিবার্য হয়ে পড়ে। একটা-দুটো ছাড়া বেশিরভাগ প্রতিক্রিয়াই কিন্তু স্বতঃপ্রণোদিত নয়। মিডিয়া জানতে চাইছে, তিনি হয়তো এড়িয়ে কিছু বলছেন। যা বলছেন, সেসব যে কোনো-না-কোনোভাবে বলা আছে তাঁর লেখায়, তা পদ্যই হোক অথবা গদ্য! তবুও বারে বারে বলাতে দোষ নেই, বরং বলা দরকারও। কিন্তু জীবনে যাপনে মনুষ্যত্বকে কেন্দ্রে রেখে সম্প্রীতির পরিকল্পনা গড়ে নিতে যে-কাজ করতে হবে আমাদের , সে-কাজ তো থমকেই থাকছে, বরং আমরা যে হাঁটছি বিপরীত মুখে।

বছর পাঁচেক আগে (১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬) প্রতীচী ট্রাস্ট গোর্কি সদনে আরও কয়েকটি সংস্থার মিলিত আয়োজনে মুসলিমদের সমস্যা নিয়ে একটি সমীক্ষা-রিপোর্ট প্রকাশ করে। সেই রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদের অর্থনৈতিক জীবনযাপনগত দুর্গতির একটা ছবি ফুটে ওঠে। সেই সভায় শঙ্খ ঘোষ বলা কথাই আবার বলেছিলেন, মুসলমানদের 'এই অবস্থা কেন হয়েছিল? আমরা জানছিলাম না কেন? পারস্পরিক অপরিচয় একটি বড়ো সমস্যা। সেই সমস্যা থেকে তৈরি হয় অজ্ঞানতা। অজ্ঞানতা থেকে তৈরি হয় অবিশ্বাস। অবিশ্বাস থেকে

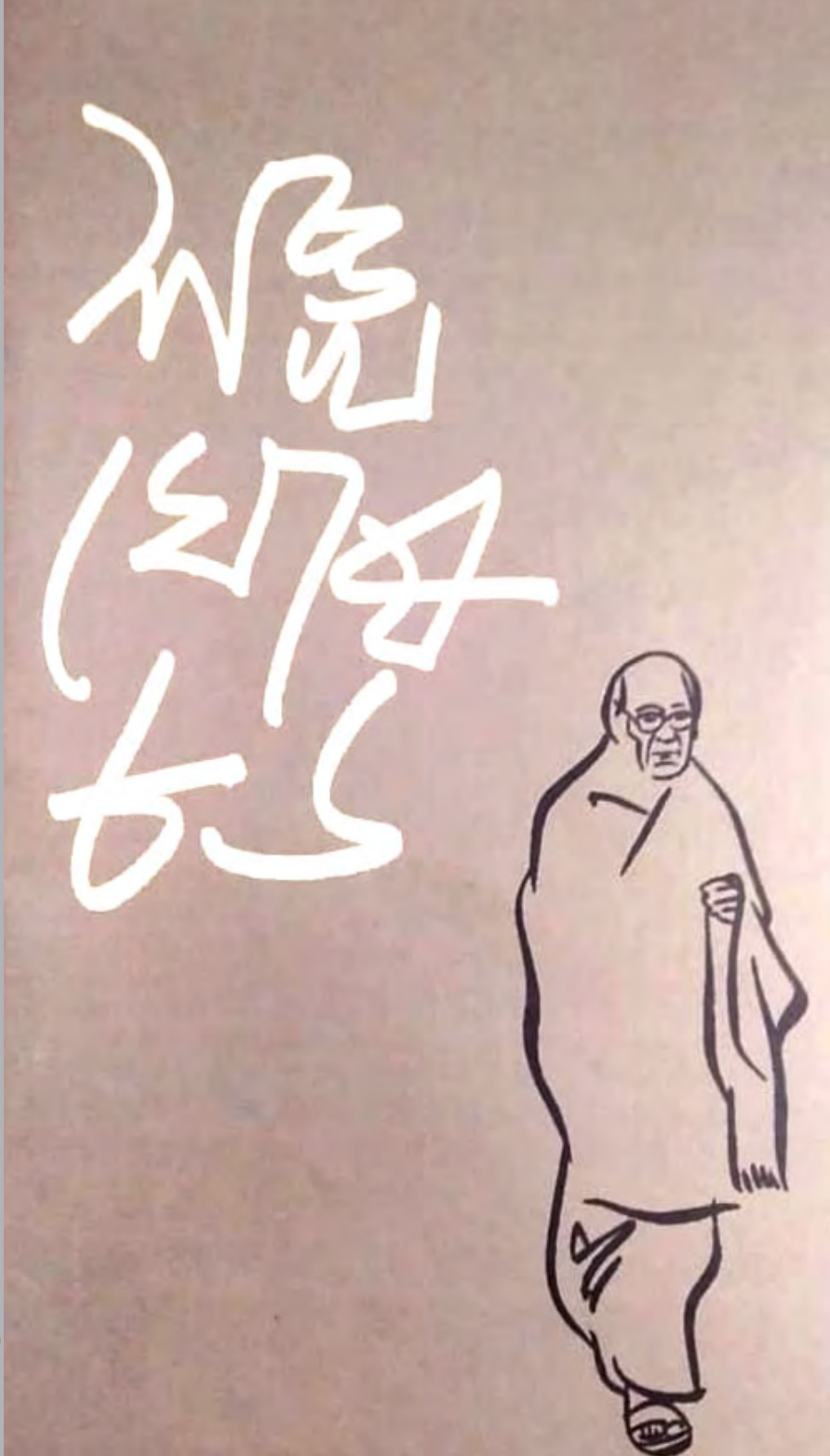

অসহিষ্ণুতা। এবং তা থেকে অশান্তি। অপরিচয়ের বিষয়টা সরকার দুর করতে পারে না। সেটা পারে সমাজ। ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায়, পরিবারে পরিবারে কীভাবে পরিচয় গড়ে তোলা যায় পারস্পরিক ভাবে তা আমাদের দেখতে হবে।'—এমন কথা তিনি আরও একাধিকসভায় উচ্চারণ করেছেন, তা আমি নিজেই শুনেছি।

দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে (২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬) নির্যাতন ও উন্মত্ততার প্রেক্ষিতে শঙ্খ বলেছিলেন: 'কেন্দ্রে নতুন সরকারের প্রতিষ্ঠার পর থেকে অনেকেই একটা দুর্বিপাকের ভয় পাচ্ছিলেন। কিন্তু সে ভয় যে এত দ্রুত, এত তীব্রতায় সত্য হয়ে উঠতে পারে, তা হয়তো সবাই অনুমান করতে পারেননি। কয়েক মাস ধরে গোটা দেশ জুড়ে পরিকল্পিত যে শোচনীয় আঘাতগুলি ঘটানো হচ্ছে, তাতে বোঝা যায় ফ্যাসিস্ট শক্তি এখন আর প্রবণতামাত্র নয়, সেই শক্তি এখন সরকারের মূল নির্ভর। দিল্লির জওহরলাল ইউনিভার্সিটির সাম্প্রতিক নির্যাতন আপাতত তার শেষ উদাহরণ। এই সব নির্বাচন আর উন্মত্ততার বিরুদ্ধে এখনই যদি সকলের সমবেত প্রতিবাদ সংগঠিত না হয়, তাহলে আমাদের সামনে আরও বড়ো সর্বনাশ অপেক্ষা করছে। আশা করি সেই অশুভ ভবিষ্যৎকে আমরা রোধ করতে পারব।'—কিন্তু সেইভাবে রোধ করতে আমরা পারছি কি?

অসমের তিনসুকিয়ায় পাঁচজন বাঙালিকে হত্যার (৩ নভেম্বর ২০১৮) প্রেক্ষিতে বলেছেন: 'বেশ কিছুকাল জুড়ে আমাদের দেশ যে একটা মহা দুর্বিপাকের দিকে এগিয়ে চলেছে, অসমের সাম্প্রতিক ঘটনা তারই একটা নতুন চিহ্ন। এখনও যদি

সবাই একসঙ্গে মিলে এর প্রতিবাদের কথা না ভাবি, তাহলে সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। আবার উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরে গো-তাণ্ডবে হিন্দুত্ববাদীদের হাতে পুলিশসহ দুজনের নিহত হওয়ার ঘটনায় তিনি বললেন: 'সাম্প্রদায়িক ভুল বোঝাবুঝি আর বিদ্বেষবোধ বাড়িয়ে তোলবার যে আয়োজন আজ গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে, সুস্থ চেতনাসম্পন্ন নাগরিক মাত্রেরই সে বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। যেকোনো ভাবে এই প্রবণতাকে প্রতিহত করতে না পারলে আমাদের বিপন্ন দেশ আরও ভয়ানক বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাবে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে অবিরাম এক সুস্থ সম্পর্কবোধ গড়ে তোলা ছাড়া আর আমাদের অন্য কোনো পথ নেই।'

এই প্রতিক্রিয়াগুলো শুনে মনে হচ্ছে না, একজন কবি বারবার বলেই চলেছেন, তবুও অমানবিক ঘটনাগুলোও ঘটেই চলেছে। এতে নিতান্তই দর্শক হয়ে থাকলে বিপজ্জনক সহিষ্ণুতার এক অভ্যেস গড়ে ওঠে, তা হয়তো একদিক থেকে আমাদের অসংবেদী করে তোলার বা প্রতিক্রিয়াহীনতার দিকে নিয়ে যেতে চায়।

কবির এইসব প্রতিক্রিয়া পড়তে পড়তেও কি আমরা বুঝতে পারছি, কবি কেন সম্মানগ্রহণের সেই অনুষ্ঠানে টোডরমলকে বলা আকবরের সেই পংক্তিমালা বেছে নিয়েছিলেন? আসলে তো কবিতায় আকবরের কণ্ঠে ছিল কবিরই স্বপ্নময় উচ্চারণ। বুঝতে কি পারছি, কেন তিনি ইকবাল অনুবাদ জরুরি মনে করেন? কেন রবীন্দ্রনাথ ও ইকবালকে তিনি আত্মশক্তির দুই কবি হিসেবে দেখতে পান?

দেখতে পান, কারণ তাঁর দেখার সুগভীর দৃষ্টি আছে বলে। দেখতে পান, কারণ তার দেখার আলোয় বাইরের সমাজ সংসার জীবন মিশিয়ে নিতে পারেন বলে। যেমন চোখের আলোয় দেখতে হয় চোখের বাইরে কিন্তু অন্যকে বা অন্যদের দেখবার সময়ে আমরা বড়ো বেশি ভাবে নিজের দিক থেকে দেখি, নিজেরই অভিজ্ঞতা থেকে, নিজেরই স্বার্থবৃত্ত থেকে। এ দেখার সঙ্গে তো আছে মনেরও যোগ। স্বার্থবৃত্তের মন যদি তার ঘেরাটোপ থেকে বাইরে বেরিয়ে খোলা মনের আঙিনায় না দাঁড়ায় তবে আর দেখার দৃষ্টি প্রসারিত হবে কীভাবে? আর শঙ্খ যে আমাদের রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে দেখার নানা স্তরের কথা বলেছেন, সেই দিকেও কি পুরোপুরি দৃষ্টি দিয়েছি আমরা? 'বিকশিত দেখা', 'ভরপুর দেখা', *ডাকঘর*-এর অমলের দেখা, *ফাল্গুনী* নাটকে অন্ধ বাউলের দেখার মধ্যে স্তরগত বা তলগত যত পার্থক্যই থাক, এমন দেখা যে স্বার্থমুক্ত তা বুঝতে পারি।

একটু আগেই বলা 'মুক্ত গণতন্ত্র' কবিতাটি নিয়ে সেই সময়ে যে তুমুল আলোড়ন, তা জনপ্রতিক্রিয়ায় জড়িয়ে কীরকম একটা রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি করেছিল। কোনো কবির কবিতায় একটা কোনো বিশেষ মুহূর্ত বন্দি হয়, প্রকাশের ছন্দ পায় অথবা একটাই কোনো শব্দ হুংকার দিয়ে আঘাতে আঘাতে কবির কাছে মূর্ত হয়ে ওঠে, তাই-ই হয়ে যেতে পারে কোনো কবিতার জন্মবীজ। সেই যে হুংকার তোলা হচ্ছে, তার মধ্যে থাকতে পারে ক্ষমতার স্পর্ধিত অসারতা। সেই অসারতায় প্রত্যাঘাত করেই লেখা হতে পারে কোনো কবিতা। এভাবেই হয়তো 'মুক্ত গণতন্ত্র' কবিতাটির জন্ম। কিন্তু তা নিয়ে কিছুদিন উত্তেজনার এক

শঙ্খ ঘোষ

মাতাল হাওয়া বইল, তাতে যেন দেখার দৃষ্টিটাই গেল গুলিয়ে। তপ্ত কথায় ঝাপসা হয়ে যায় মন। কিন্তু আমরা যদি ভাবি, কবিতাটির নাম 'মুক্ত গণতন্ত্র' না দিয়ে খড়্গ হাতে উন্নয়নও কবি দিতে পারতেন। কেন তা করলেন না?—তার একটা কারণ তো এই, তিনি একটি বিশেষকে নির্বিশেষের মার্গে পৌঁছে। দিতে চাইছেন, যাতে দেশের ধ্বস্ত বহমান গণতন্ত্রের চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখানে ঔদ্ধত্য নেই, শ্লেষ আছে, প্রত্যক্ষ ছেড়ে ইঙ্গিতময় এক ব্যাপ্তিতে পৌঁছনো আছে, গণতন্ত্র নিয়ে বিস্ময়বোধক এক চাপা অট্টহাসি আছে। কোনো রাজনৈতিক শিবিরবিলাসীর চোখ দিয়ে, বলা ভালো সেই মন নিয়ে, কবিতাটি পড়লে বিপরীত শিবিরের বিপক্ষে জ্বালা জুড়োবার মতো একটা উত্তেজনা তৈরি হতে পারে। আবার ওই বিপরীত শিবিরেরও ক্রোধ বেড়ে যেতে পারে এতখানি যে তাদের মনে হতে পারে তারা যেন কবির সশস্ত্র আক্রমণের লক্ষ্য। অতীত-ভবিষ্যৎ ভুলে শুধুমাত্র যদি বর্তমানকে নিয়েই বেশিরকম মেতে উঠি, তখন ভিতর থেকে দেখার ভিতটাই দুর্বল হয়ে যায়, তখন মারমুখী উত্তেজনায় তেতে উঠতে পারে মন। কবি চাইলেন একটা অসাড় ফাঁপা প্রবঞ্চনার দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে, কিন্তু তা গিয়ে আছড়ে পড়ল সংকীর্ণ দলীয়তার উঠোনে। এতে যে কবির যাত্রাপথ অবরুদ্ধ হয় তা নয়, বরং আমরা ঢুকে পড়ি আমাদেরই অন্ধ মনের খাঁচায়। আমরা হানাহানি করে মরছি, কবি কিন্তু তাঁর কথা বলছেন আপোষহীন স্পর্ধায়, অথচ শান্ত স্বরে, সংহত সংযমে।

কবি শঙ্খর প্রয়াণের পরদিন বিভিন্ন সংবাদপত্রে নানা শোকলিপি বেরিয়েছে। শঙ্খ-অনুরাগী এক কবির শোকলিপির

শিরোনাম ছিল: 'সঙ্কটে বার বার উদ্ধত হয়েছে কলম'। উদ্ধত হয়েছে? তাঁর কলম প্রতিবাদে উদ্যত ছিল নিশ্চয়ই, তাই বলে উদ্ধত? রাষ্ট্রশক্তির কোনো অন্যায়, কোনো অসামাজিক দুরাচারের বিরুদ্ধে যখন তাঁর কলম উদ্যত হয়েছে, তখন কি আমরা দেখতে পেয়েছি তাঁর মধ্যে কোনোরকম দুর্বিনীতের সহিংস প্রকাশ? এমনকি গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে যে লিখেছিলেন, 'তিন রাউন্ড গুলি খেলে তেইশজন মরে যায় লোকে এত বজ্জাত হয়েছে।। স্কুলের যে ছেলেগুলি চৌকাঠেই ধ্বসে গেল অবশ্যই তারা ছিল সমাজবিরোধী।'— তাকেও কি বলতে পারি উদ্ধত? স্পর্ধিত স্বর নিশ্চয়ই, তবু কোলাহলমুখর প্রতিবাদ থেকে সরে এসে এ হল প্রতিবাদের আরও শান্ত সংযত আগ্নেয় বা বিস্ফোরক ভঙ্গি। যদি উদ্ধতই হবেন, তবে আর বলতেন না 'নিঃশব্দে নিঃশব্দ' কবিতা লেখার কথা। ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে অসংবৃত প্রগল্ভ প্রবল উচ্চারণের কবি তিনি নন। তাই তাকে বলতে হয়, মানুষেরা বড়ো বেশি প্রগল্ভতা করে ফেলে আজ—/ক্ষমা করে দাও। পুলিশের তিন রাউন্ড গুলিতে যে তেইশজনের মরে যাওয়ায়, মৃতরাই যেন কাঠগড়ায়, শাসক নয়—প্রত্যক্ষের প্রগল্ভতা থেকে সরে এসে সংবৃত সংযমের যে-পথ তিনি নিয়েছেন, তাতে শাসকের বিরুদ্ধে ক্রোধের মধ্যেও লীন হয়ে আছে সুস্থ সমাজের জন্য এক আর্তি। ওই নিঃশব্দ আর্তিটুকুই তাঁর জপমন্ত্র, রোষের কবিতায়ও আপোষহীন দৃঢ়, তবু অনুদ্ধত শক্তি। তাঁর কবিতায় বা গদ্যের ওই তলটুকু যদি আমরা ছুঁয়ে থাকতে না পারি, তবে তাঁর 'উদ্ধত কলম'-এর বিশ্বাস নিয়েই মুহূর্তের কোনো জ্বালা জুড়োতে চাইব আমরা।

কবি-প্রয়াণের পরের দিন সংবাদপত্রে আরও যত শোকার্ত প্রতিক্রিয়া পাচ্ছিলাম, তার মধ্যে এক রাজনৈতিক নেতার প্রতিক্রিয়া ছিল এইরকম: তিনি আমাদের হাতে হাত রেখে বিরোধিতা করতেন। কীরকম বিশ্বাসে ভর করে তিনি কথাটা বলেছেন জানি না। কিন্তু এটাও হতে পারে কবিকে বোঝার একটা স্তর। এই বোঝাটুকু কতটা ভিতর থেকে দেখার মতো ভিতর থেকে বোঝা হল, সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু নিয়ত সেই বিশ্বাস ভিতরে ধরে রাখতে পারলে আমাদের মনের সংকীর্ণ মানচিত্রটা যে অনেকটাই বদলে যেতে পারে, এতে কোনো ভুল নেই। তখন হয়তো সত্যিই আমাদের বুঝে ফেলা সহজ 'সকলেরই শুভ চেয়ে শুভ হবে ভেবে' কবি সকলেরই হাতে হাত রেখে কখনো তাদেরই অন্যায়ের বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে জেগে থাকার ধর্মপালন করছেন। এত রকম সামাজিক রাষ্ট্রীয় ব্যাধি আর রুগ্নতার মাঝে তিনি যে কেবলই আরোগ্যপথের ইশারা রেখে গেলেন, তা ভিতরে নিতে চাইছি কতখানি?

রবীন্দ্রপথে হাঁটা আর রবীন্দ্ররথের ধ্বজা উড়িয়ে চলা এক নয়। এর একটায় আছে জাগিয়ে তোলা, আরেকটায় মাতিয়ে তোলা। জাগিয়ে তোলায় চাই ধৈর্য, মগ্নতা, স্থিরতা, আর মাতিয়ে তোলায় থাকে উদ্‌যাপনের আড়ম্বর, যা ক্ষণিক উন্মাদনার স্রোতে ভেসে যায়। ধৈর্য, মগ্নতা, স্থিরতা আমাদের নিয়ে যেতে পারে জড়তাহীন স্বচ্ছ মুক্তমনের দিকে।।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কমিউনিস্ট সংসদবিদ হওয়া সত্ত্বেও দলের 'যন্ত্রবৎ' বিচারবোধের বাইরে তাঁর যে মুক্তচিন্তা তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন শঙ্খ ঘোষ। তিনি হীরেন্দ্রনাথের মধ্যে

ページ
足(13)
写真

দেখতে পান প্রত্যক্ষ হয়ে থাকা ‘সজীব এক দায়বোধ, গোটা সভ্যতার জন্য গভীর এক উৎকণ্ঠা। তাঁর স্বরের মধ্যে আলোড়িত হতে থাকে সর্বাত্মক এক ভালোবাসার কথা, সমগ্র এই দেশের জন্য ব্যাকুল এক ভালোবাসা। তাঁর স্বরের মধ্যে জেগে থাকে অপরাজেয়, আর অপরিমেয় এক আশা’, শোষণহীন কোনো মুক্ত সমাজের আশা। ‘আকৈশোর রবীন্দ্রনাথে তাঁর নির্ভরতা’, ডুবে থাকা, ‘রবীন্দ্রনাথের জীবন আর সৃষ্টি থেকে তাঁর শক্তি খুঁজে পাওয়া’ হীরেন্দ্রনাথকে নিয়ে যায় মুক্তমনের দিকে।।

এই মুক্তমন আর দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা থেকেই শঙ্খ জ্ঞানপীঠ পুরস্কারের সভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন মতপ্রকাশের স্বাধীনতার কথা, জানিয়েছিলেন লেখক আর দেশের সব নাগরিককে দেশের চরম সর্বনাশ প্রতিহত করার আহ্বান। আর পড়তে চেয়েছিলেন *গান্ধর্ব*-র সেই কবিতা যেখানে আছে ধর্ম নয়, মানুষ পরিচয়ে সকলের জেগে ওঠার গীতিময় প্রার্থনা।

কবির জন্মদিনে প্রকাশিত পুস্তিকার প্রচ্ছদ লেখকের সংগ্রহ থেকে ব্যবহার করা হল

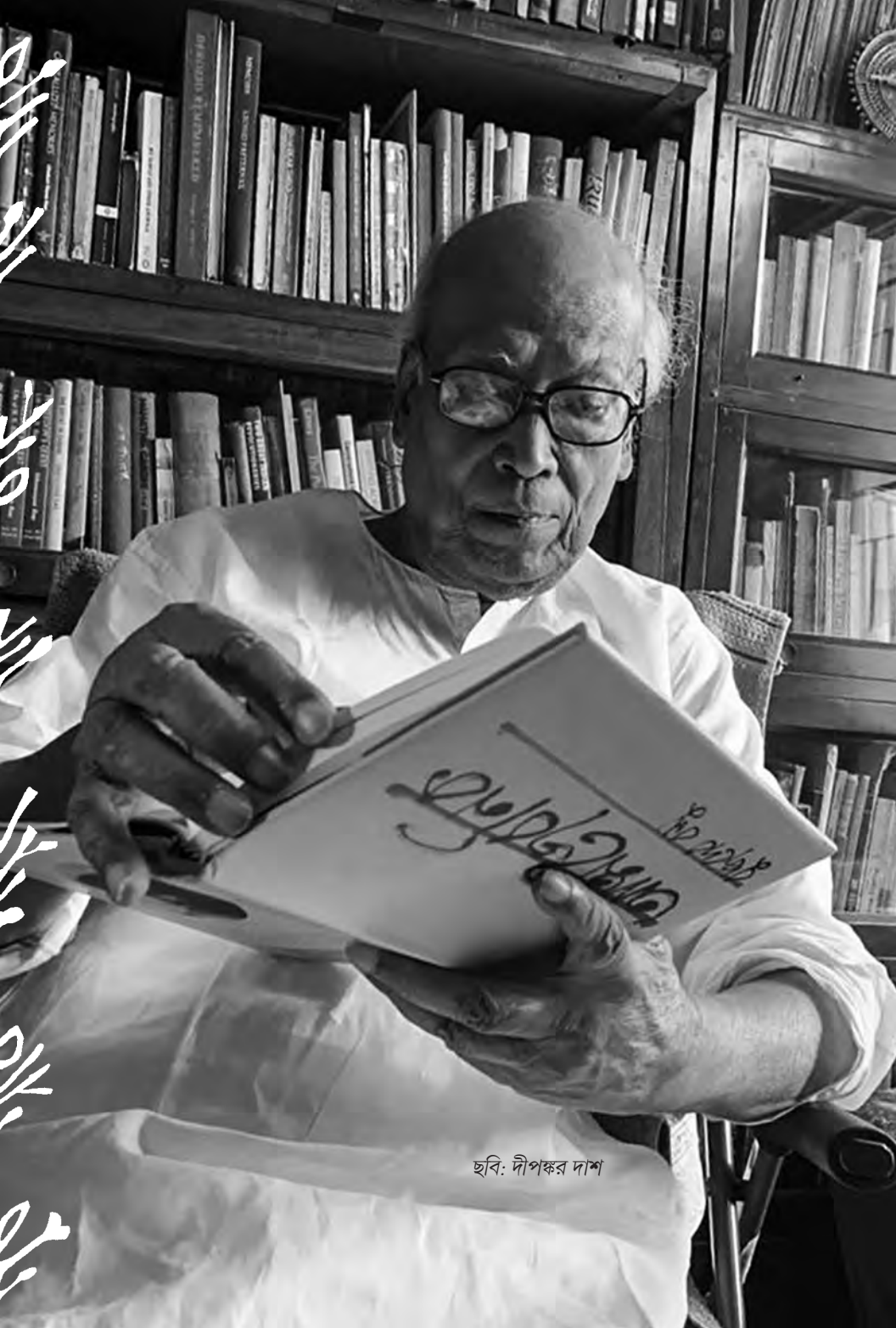

ছবি: দীপঙ্কর দাশ

Vivan Sundaram

The Poem on the Dome and a Poet

A site-specific installation in the Durbar Hall of the Victoria Memorial, Calcutta, to mark the fiftieth anniversary of India's Independence. A text mural befitting the occasion within the dome of the Hall, at a height of 70 feet, to counter the neo-baroque colonial architecture. Two stanzas of poetry on opposite sides of the walls of the oblong form—illuminated by jewel-like skylights in an exquisite floating frame.

Rabindranath Tagore's poetry would be appropriate for marking the pre-independence era.

I asked Pranab Ranjan Ray, an old friend who was advising me on the project—he said the best person to suggest lines from Tagore would be Shankha Ghosh, and took me to meet him.

Shankha-da received me graciously. With some trepidation, I told him about the inclusive nature of my site-specific installation in the imperial edifice, interrogated through spatial and temporal dynamics and represented by a multiplicity of materials and objects - grounded with iron, life-size human figures, historical and personal data, the pain of an actress, poetry in the sky. I spoke of the ephemeral nature of this genre, the fragility of the form.

Shankha-da listened to me with curious but engaged attention. I then asked him if he would select a stanza of Rabindranath Tagore's poetry. This would be stenciled in Bengali and English on the interior of the dome, a single line as long as 12 feet.

He looked at me astounded. He said he would never have thought that poetry would be inscribed in the dome of the Durbar Hall. Progressive and left

writers had always boycotted the Victoria Memorial and he himself had not to this day entered the building. I had put a great burden on him. He remained silent for a while and then, in his quiet and gentle manner, he said he could never have imagined such a configuration of diverse themes on the making of modern Bengal in this ceremonial space. I had given him a difficult task, but he

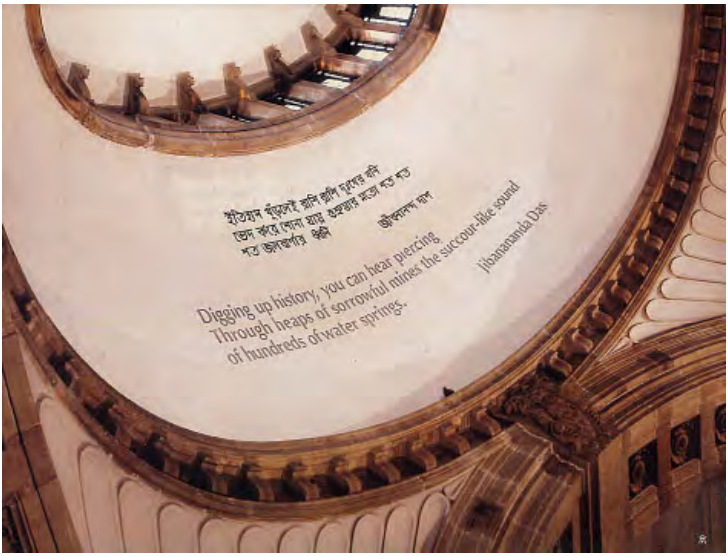

asked me to come back after a few days. Meanwhile he would look for a stanza to be inscribed on one side of the oblong architecture.

I then plucked up the courage to ask Shankha-da, could he suggest a person who could give me a few lines by Jibanananda Das, for the other side of the dome? Quick came his answer: the young writer Sibaji Bandyopadhyay.

* * *

Amid the din of voices at the exhibition opening, the incomplete song's echo reverberated in the dome.

Shankha-da looked up to hear the 'dissatisfied sighs in the wind'. Nineteenth-century verses from little magazines printed on a scroll of acetate sheets floated down from the skylights to come to rest on a cast-iron printing press. His hands passed over both materials in a nostalgic manner. They recalled the age of the letter press, Shankha-da's world of printed matter. He smiled and I got the feeling he was at home within the installation. About Shankha Ghosh's poem 'The House', the poet Satchidanandan writes: "Solidity and fluidity are presented here in their dialectical relationship."

Familiar texts written in Bengali and English on life-size human bodies made by Kalighat craftsmen, of well-known characters from the theatre whose declamatory forms of representation lost their dramatic aura as the public mingled around them. This de-theatricalizing appealed to Shankha-da.

He did not expect to come across the beautiful mahogany table used by Bankim Chandra Chattopadhyay. Behind the table was a bookshelf, 6 x 3 feet, with 400 books on modern Bengal. Shankha-da, who wore his formidable scholarship rather lightly, scrutinized the titles very carefully, to find they were just facsimiles pasted on small blocks of wood, compressed between two sheets of glass. This amused him greatly.

Another presentation of historical data was in the form of a 'wall' of 700 freedom fighters in the space where the Viceroy would have been seated. These were on the spines of file-boxes, which had their names with birth and death dates, as well as their portrait photographs—potential IDs of the 'enemies' of colonial rule. Shankha-da said this was a historic wall, he had never seen so many photographs of such a range of freedom fighters. He read the caption which said that visitors could pull out a box if

they had any relevant archival information to contribute. But the guard said this option had been discontinued.

A massive black wagon, a container on wheels, was placed at the end of a railway track in front of the archival data. Sibaji and I solemnly accompanied Shankha-da into the pitch-dark chamber, to listen to tragic poems and songs about the famine and partition.

"For your convenience you called it 'food'.
But why make things difficult?,
Coarse or fine or even crawling
with worms."

"Memories of the past
Some forget, others don't."

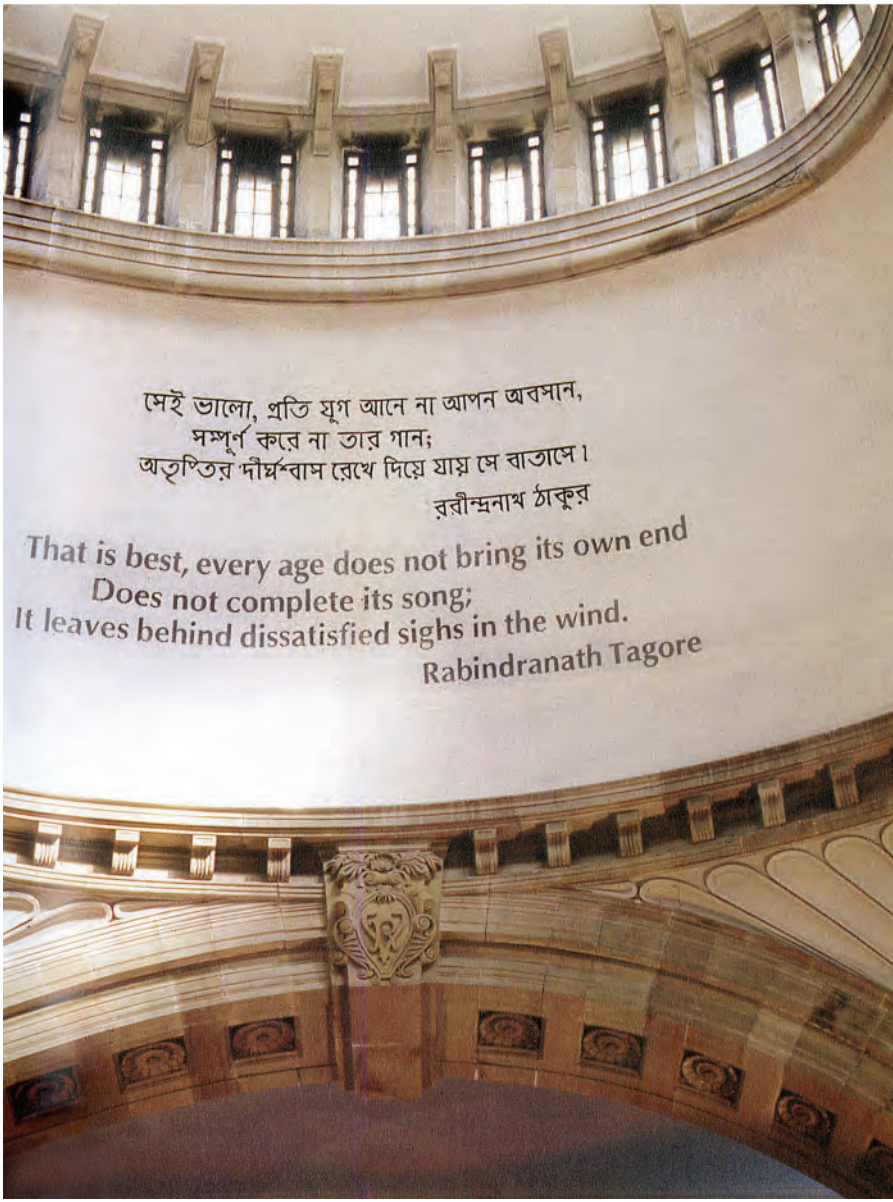
সেই ভালো, প্রতি যুগ আনে না আপন অবসান,
সম্পূর্ণ করে না তার গান;
অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস রেখে দিয়ে যায় সে বাতাসে।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
That is best, every age does not bring its own end
Does not complete its song;
It leaves behind dissatisfied sighs in the wind.
Rabindranath Tagore

Shankha-da wore a grave and troubled expression. We stepped out of the wagon on to a platform meant for performance and poetry-reading. He looked up to get his bearings and saw Tagore's lines inscribed in the dome:

"*That is best, every age does not bring its own end*
Does not complete its own song;
It leaves behind dissatisfied sighs in the wind."

22 June 2021

Pic: Somnath Ghosh

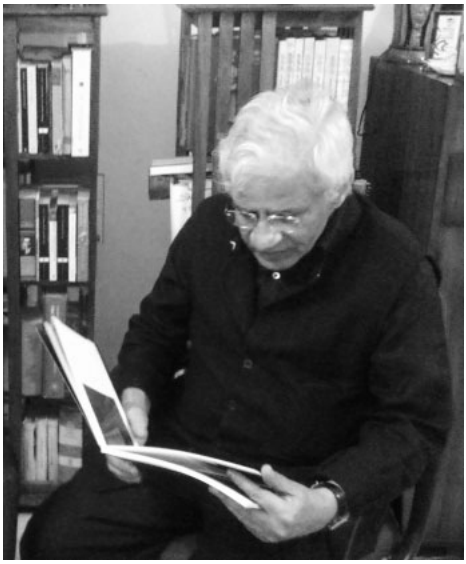

Vivan Sundaram at Sibaji Bandyopadhyay's place

ছবি: দীপঙ্কর দাশ

রুশতী সেন

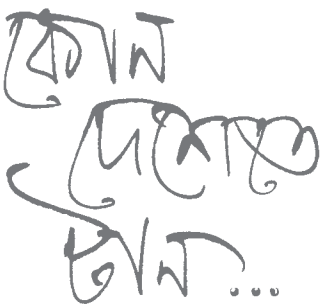

কোন দেশান্তে টান…

গত ১৬ এপ্রিল, ২০২১ অপুর কাছে শুনেছিলাম, শঙ্খ ঘোষের একটি অগ্রন্থিত কবিতার হদিস পেয়েছে সে। ‘দেশান্তর’। ১৯৫৪ সালে ‘ক্রান্তি’ পত্রিকার কোনো এক সংখ্যায় বেরিয়েছিল। ২১ এপ্রিল চলে গেলেন শঙ্খ ঘোষ। ৯ মে ‘প্রতিদিন’-এ ‘রোববার’-এর প্রচ্ছদকাহিনির শিরোনাম ছিল ‘রবিশঙ্খ’। সেখানে অপু অর্থাৎ শুভঙ্কর দে-র প্রাক্‌কথন সমেত ‘দেশান্তর’-কে পাওয়া গেল। বড়ো অশান্তি হচ্ছিল কবিতাটি পড়ে। সত্যিই কি অগ্রন্থিত? তবে তো অন্তত আমার পক্ষে এ-কবিতা আগে পড়া সম্ভব নয়! তবু এত চেনা লাগছে কেন?

ধীরে নৌকা বাও
গ্রাম পেরোলো, সাঁকো পেরোয়, পেরোয় হাটের ধূম
এ পারে ম্লান সেঁজুতি আর ওপারে ম্লান ঘুম—
ধীরে নৌকা বাও
কোন দেশে রে মাঝি সাহেব কোন দেশেতে টান
সেই দেশও কি আমারই দেশ, সেই দেশও কি প্রাণ?
ধীরে নৌকা বাও।।

তবে বুঝি গুলিয়ে ফেলছি আমি। 'ক্রান্তি' পত্রিকায় এ-কবিতা প্রকাশের ছত্রিশ বছর পরে গ্রন্থিত *সুপুরিবনের সারি* উপন্যাসের অন্তিম নৌকোযাত্রা ভর করেছে পাঠককে 'দেশান্তর' পাঠের সুবাদে? হঠাৎ করে বিদেশ হয়ে যাওয়া আজন্মের দেশ থেকে সম্ভবত শেষবার ফিরতে ফিরতে নৌকোর ছইয়ের উপরে বসে কিশোর নীলু শুনেছিল বড়োমামার গলা, 'ওই দেখ্ শুরু হলো বড়ো সুপুরিবনটা ... ওই পর্যন্তই হলো আমাদের গ্রামের সীমা। ব্যস্, তারপর, শেষ' আর ভেবেছিল, 'প্রণাম তোমায়, শেষ... প্রণাম, ওই খালের মুখে নদীর জলের ঢেউ। প্রণাম তোমায় তুলসীতলা, মঠ... প্রণাম ... সুপুরিবনের সারি'(শঙ্খ ঘোষ, *সুপুরিবনের সারি*, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৯০, পৃ-৮৭-৮৮)। সেদিন নৌকা বাইছিল বহুদিনের পরিচিত মাঝি রহমত। ওই যাত্রায় কি মিশে ছিল 'কোন দেশে রে মাঝি সাহেব কোন দেশেতে টান/ সেই দেশও কি আমারই দেশ, সেই দেশও কি প্রাণ'?

কিন্তু *সুপুরিবনের সারি*-র লেখক তো নাকি ভুলেই গিয়েছিলেন 'দেশান্তর' কবিতাটির কথা! অপুকে বলেছিলেন, "তখন...কলেজ স্ট্রিটে...তিনতলার ওপর একটা ঘরে থাকি... মাঝে মাঝেই বীরেনদা (বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) ও সুভাষদা

(সুভাষ মুখোপাধ্যায়) আসতেন। গল্প করতেন আর কবিতা লেখা দেখতে পেলেই নিয়ে চলে যেতেন। কোথাও না কোথাও তাঁরাই উদ্যোগ নিয়ে সেটা ছাপাতেন। এই কবিতাটাও বীরেনদা নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার মনে ছিল না আর"। মনে যেমন ছিল না, তেমনই বিস্মৃতির কোন অতলে ও-কবিতার উৎস নিশ্চয় বড়ো বেদনার মতো বাজত প্রাণে! যখন লেখা হয়েছে 'দেশান্তর', শঙ্খ ঘোষের ঠিকানা তখন কলেজ স্ট্রিটের কলাবাগানে, ১/২ শম্ভু চ্যাটার্জি স্ট্রিটে, বড়োসড়ো একখানা পাঁচতলা বাড়ির তিনতলার একটি বড়ো ঘরে। আজন্মের দেশ বিদেশ হয়ে গেছে, শহর কলকাতায় উদ্‌বাস্তু পরিবারটি প্রথম আবাস পেয়েছে ওই ১/২ শম্ভু চ্যাটার্জি স্ট্রিটে। শঙ্খ ঘোষের লেখায় আছে:

> কলকাতায় চলে এসেছি আমরা। রেলওয়ে অফিস থাকবার একটা সাময়িক আস্তানা দিয়েছে তার কর্মীদের। আমাদের উত্তেজনার আর অন্ত নেই। কেননা কলাবাগান বস্তির মধ্যে বিশাল এক পাঁচতলা বাড়ির তিনতলায় দাদাও পেয়ে গেছে একখানা ঘর। উদ্‌বাস্তু আমাদের তবে একখানা ঘর হলো কলকাতায়।...পুবদক্ষিণ-ঘেরা রেলিংগাঁথা অপ্রসর একটা বারান্দাও আছে সঙ্গে। বাক্সবিছানা আর আলনা দিয়ে ঘরটাকে দুভাগ করে নিলে, পুববারান্দায় উনুন আর দক্ষিণবারান্দায় একটা মাদুর পেতে নিলে তো রান্নাঘর বসার ঘর সুদ্ধ চার-চারটে ঘরই কল্পনা করে নেওয়া যায়। আমরা সবাই তো বটেই, কাকার বাড়ির মামার বাড়ির অনেকেও অনেকসময়ে একসঙ্গে থেকে যাই সেখানে, বাস্তু হারাবার ভাবনাটাকে লুকিয়ে রাখতে চাই একসঙ্গে মিলেমিশে হৈ চৈ করে—(শঙ্খ ঘোষ, 'দাদার মতো দাদা', *সামান্য অসামান্য*, প্যাপিরাস,২০০৬, পৃ-৩৩)।

কলাবাগানের ওই বাড়ি যখন দেখতে গিয়েছিলাম সত্যপ্রিয় ঘোষের সৃজন আর জীবন প্রসঙ্গে কাজ করবার সূত্রে, শঙ্খ

ঘোষ পরম আগ্রহে সে-বাড়ির ছাদ পর্যন্ত উঠেছিলেন আমার সঙ্গে। তিনতলার ঘরটিতে অবশ্য ঢোকা যায়নি। সাম্প্রতিক আবাসিকদের একজন এরকম আজগুবি আগ্রহে বেশ বিরক্ত হয়েছিলেন, মুখের ওপর বলেছিলেন শঙ্খ ঘোষকে, "ইসমে দেখনে কা ক্যা হ্যায়? পচাস-ষাট বরস তো বহুৎ দিনকি বাত হ্যায়... নিকল যাইয়ে অভি"। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পুবের বারান্দাটি দেখিয়ে বলেছিলেন শঙ্খ, "বৃষ্টি না পড়লে ওখানে মা উনান ধরাতেন। বৃষ্টি হলে মা-র রান্নাঘর বারান্দা থেকে ঢুকে যেত ঘরের মধ্যে"। 'দেশান্তর' কবিতার শুরুতেই আমার মনে পড়ল তাঁর সেই দেখানোর আর চেনানোর চলন:

আকাশ শোনে শব্দ, শোনো
বাতাস বাজায় হাত—
বৃষ্টি নাচে ঝুমুর ঝুমুর
দৃষ্টি হারায় রাত।
ঝড়ের মারে ঘর ভেঙে যায়
চল্‌কে ওঠে জল—
পলকহারা কান্না লুটায়
ঢেউয়ের তলে তল।
মাঝি সাহেব মাঝি সাহেব
থামাও রে বন্যা—
ধীরে নৌকা বাও রে, শোনো---
মায়ের কাঁদন না?

তাঁর কাছেই শুনেছি, ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৫-র শেষ পর্যন্ত ছিলেন তাঁরা ১/২ শম্ভু চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়িতে। ১৯৫৬-র শুরুতে রেলের কর্মী সত্যপ্রিয় ঘোষ আর তাঁর পরিবারের বাসাবদল ১৩০ নম্বর নারকেলডাঙা রেল কলোনিতে।

পরের আবাস শিয়ালদহের কাইজার স্ট্রিটে ২২৩ নম্বর রেল কোয়ার্টারস। তখন ১৯৫৯। 'দেশান্তর'-এর প্রথম প্রকাশ ১৯৫৪-য়। এ মাঝি সাহেব *সুপুরিবনের সারি*-র রহমত মাঝি নয় তবে। ও-সম্বোধন ইতিহাসের মারের সঙ্গে জটিলতর বোঝাপড়ার ইঙ্গিত হয়তো। যে-বোঝাপড়ার সামর্থ্য কেবল কবিরই থাকে। 'দেশান্তর' কবিতাটি হারিয়ে গিয়েছিল কবির মন থেকে। কিন্তু ওই নৌকোযাত্রা কবি আজীবন বহন করেছেন শরীরে-মনে।

'দেশান্তর'-এর হদিস পাওয়ার আগে *সুপুরিবনের সারি*-র বিষাদ, বিশুমামার সেই হাহাকার, '...এরই জন্য কি এতদিন ধরে লড়লাম আমরা? এই ভাঙা দেশের জন্য? এই দেশভাঙার জন্য' (শঙ্খ ঘোষ, *সুপুরিবনের সারি*, পৃ-৮২), দাদুর সেই মরিয়া প্রশ্ন, 'নিজের দেশটা কি রাতারাতি অন্যের দেশ হয়ে যায় নাকি? হতে পারে কখনো?' (ওই, পৃ-৬৪), হারুণের ব্যক্ত আকুলতার উত্তরে বা নিরুত্তরে নীলুর অব্যক্ত আবেগ, এসব মূর্ছনা পাঠক মেলাতে পারতেন *সুপুরিবনের সারি*-র বারোবছর পরে প্রকাশিত *বড়ো হওয়া খুব ভুল* (দোয়েল, ২০০২)-এর 'স্থলপদ্ম', 'হারিয়ে-যাওয়া দেশ', 'পানসুপুরি', 'চামে-কাটা দেশ', 'বাড়ি', 'ঠাকুরদাদার মঠ', 'সবার দেশই সবার ভালো'-র মতো কত কত কবিতায়! কবি নিজে যাদের বলেছেন 'ছড়াকবিতা'। আজ যখন 'দেশান্তর' পাঠকের নাগালে এসেছে কবির প্রয়াণের পরে, পাঠক দেখেন, পরদেশ হয়ে যাওয়া আজন্মের দেশকে ছেড়ে আসার সেই বিষণ্ণ নৌকোযাত্রা বিছিয়ে আছে ছড়াকবিতার ছত্রে ছত্রে। মনে না থাকলেও, কবির প্রাণ থেকে 'দেশান্তর' হারায়নি

কোনোদিন। 'কোন দেশে রে মাঝি সাহেব কোন দেশেতে টান/ সেই দেশও কি আমারই দেশ, সেই দেশও কি প্রাণ' পড়তে পড়তে প্রায় পাঁচদশক পরে লেখা 'পানসুপুরি'র ছন্দবন্ধন ভর করে পাঠককে:

পুজোর ছুটির শেষে যখন দেশের বাড়ি থেকে
খাল পেরিয়ে নৌকো যেত নদীর দিকে বেঁকে
আমরা কেউ-বা ছইয়ের ওপর কেউ-বা পাটাতনে
বসে বসে ভেবে যেতাম, কোন্‌খানে কোন্ কোণে
রইল পড়ে টান আমাদের রইল পড়ে প্রাণ

(*বড়ো হওয়া খুব ভুল*, পৃ-১৯)

অথবা,

ইকড়িমিকড়ি চামচিকড়ি
চামে-কাটা দেশ
এখন সবাই বলছে তোমার
সময় হলো শেষ!
নৌকো চলে ফিরতি-মুখে
নৌকো চলে ভেসে
দামোদরের হাঁড়িকুড়ি
রয়েছে পাড় ঘেঁষে।
বিদায় নেবার সময় হলো
ভাতে পড়ল মাছি
কেউ জানে না আমরা এখন
কোথায় ভেসে আছি

('চামে-কাটা দেশ', ওই, পৃ-২১)

'চামে-কাটা দেশ'-এর অন্তিম পংক্তি চারটি পাঠককে ফিরিয়ে দেয় *সুপুরিবনের সারি*-র নৌকোযাত্রার আগের সেই 'যাত্রা করা'র অংশটুকু। "...আসনে বসে বড়োদের প্রণাম করতে

হবে একে একে, ধান দুর্বো মাথায় দিয়ে আশীর্বাদ করবেন তাঁরা। তারপর আমের পল্লব বসানো সিঁদুর মাখানো ঘটের কাছে মাটিতে মাথা রেখে মনে মনে চাইতে হবে বিদায়, আর তারপর সেই কলসের টল্‌টলে জলে নিজের মুখের ছায়া দেখতে হবে নিচু হয়ে, মনে মন বলতে হবে 'আবার আসব', তারপর উঠে, পিছন দিকে একবারও না তাকিয়ে, বেরিয়ে যেতে হবে... 'আবার আসব'—মনে মনে বলতে গিয়েও কথাটা আটকে গেল নীলুর গলায়। সত্যি তো নয় সেটা। ঠিক হবে কি বলা?"(শঙ্খ ঘোষ, *সুপুরিবনের সারি*, পৃ-৮৫)। 'চামে-কাটা দেশ'-এ 'কেউ জানে না আমরা এখন / কোথায় ভেসে আছি'-র পরে দেখি,

জলে নিজের মুখ দেখি না
কেউ কখনো আর
ঢেউ দিয়েছে চারদিকে ওই
অথই পারাবার।

(*বড়ো হওয়া খুব ভুল*, পৃ-২১)

ঠিক পরের কবিতায় আছে, 'আজ শুধু দিই পাড়ি/ ধু ধু করা বালিয়াড়ি/ তবু মনে পড়ে আমারও তো ছিল/ ছুটিতে যাবার বাড়ি।/...আজও যে আমার মনে পড়ে তার/ সুপুরিবনের সারি'(ওই, পৃ-২৩)। 'বাড়ি' ছাড়া আর কীই-বা হতে পারে এই কবিতার নাম? বিনিসুতোয় গাঁথা শিউলিফুলের মালার মতো এই আশ্চর্য লিখনগুলির ভিতরের কথাটা যেন আর নিজেকে আড়াল করতে পারে না 'সবার দেশই সবার ভালো'তে পৌঁছে:

সে আজ আমায় ডাক দিয়েছে আদ্যিকালের থেকে
চলো আমরা সেইখানে যাই এখনই প্রত্যেকে।
তোমার গ্রামকে তুচ্ছ করছি? তুলনা থাক্, ছি!
সবার দেশই সবার ভালো—আমারটা পাক্শি।

(ওই, পৃ-২৭)

সেই পাক্শি! যেখানে ছিল চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাপীঠ নামে ছোট্ট একটা স্কুল। সেই স্কুলের লাগোয়া ছিল হেডমাস্টারমশায়ের বাড়ি। পাক্শি দেশের অধিবাসীর তখন ছিল অল্পবয়স, কল্পবয়স। এসব অনেক পুরোনো গল্প, হারিয়ে যাওয়া 'দেশান্তর'-এর আগেকার কথা সব। কিন্তু সেকালের অল্পবয়সের কথা একালের অল্পবয়সের দুয়ারে এসে দাঁড়াল হারিয়ে যাওয়া 'দেশান্তর'-এর প্রায় পাঁচ দশক পরে।

'দেশান্তর'-এ আছে, ' বৃষ্টি পড়ে ঝুমুর ঝুমুর/ সৃষ্টিরা সাত খান্—/ ভুলবে কে এ গ্রামের ছবি/ ভুলবে কে আখ্যান?' এই জিজ্ঞাসার উত্তরেই যেন কবিতাটি অন্তিমে পৌঁছয়:

বৃষ্টি পড়ে ঝুপুর ঝুপুর
দৃষ্টি খোঁজে রাত।
এই ঘাটে এক সহস্র চোখ
ঐ ঘাটে এক লাখ ---
পাতায় পাতায় শাখায় শাখায়
লুটায় তারার ডাক!
চোখ জুড়ে তার ফিস্ফিসানি
হাত জুড়ে তার গান ;
ধীরে ধীরে বাও রে মাঝি
ভুলবো না আখ্যান।।

এ-কবিতার অন্তর্লীন অঙ্গীকার 'দেশান্তর'-এর কবিকে ছেড়ে

যায়নি কোনোদিন। 'ভুলবো না আখ্যান'-এর রেশ বিছিয়েই তো একালের অল্পবয়সের জন্য 'দেশান্তর'-এর একযুগ পরে লেখা হলো 'তুমি আমার ভৈরবী গান / কিংবা ভোরে খোলা আজান/ জলের কোলে সারিগানের রেশ—/ তুমি আমার চিরকালীন/ একলা থাকার দুঃখেতে লীন/ তুমি আমার হারিয়ে-যাওয়া দেশ!' ('হারিয়ে-যাওয়া দেশ', ওই, পৃ-১৭)। *বড়ো হওয়া খুব ভুল*-এর তিনবছর পরে প্রকাশিত *বল্ তো দেখি কেমন হতো* (দোয়েল, ২০০৫) সংকলনের 'সাঁকো', 'ধরো' কিংবা 'ভাবো'-র মতো ছড়াকবিতাও তো ওই একই আখ্যানের কাছে সমর্পণ! কবেকার সেই নৌকোযাত্রার বিষাদ তখনও বানিয়ে তুলতে চায় এমন এক স্বপ্নের স্বদেশ, ইতিহাসের হাজার মারেও যা বিদেশ হয়ে যায় না। ২০১৪-য় প্রকাশিত *ইচ্ছেপ্রদীপ* (লালমাটি) সংকলনের একেবারে শেষে আছে 'উপহার' নামের অনবদ্য কবিতাটি:

আমার কাছে চাইছ মাত্র
একটা উপহারই
চাইছ সবই নতুন আসুক
হোক পুরোনো শেষ---
এই অবেলায় তেমন তেমন
কীই-বা দিতে পারি?
তোমার হাতে দিলাম আমার
চোখ জুড়োনো দেশ।
('উপহার', *ইচ্ছেপ্রদীপ*, পৃ-৪৪)

'দেশান্তর' নিয়ে যে বিস্মৃতি কবির, সে-বিস্মৃতির স্রোতের উপরে তবে ফিরে ফিরে ভেসে উঠেছে 'ভুলব না আখ্যান'-এর বিষণ্ণ অঙ্গীকার। বালক-বালিকাদের জন্য লেখা কবিতায়

'দেশান্তর'-এর প্রক্ষেপ মিলে মিশে গেছে বারবার। গত শতকের সাতের দশকের শেষদিকে লেখা 'উল্টোরথ' কবিতাটি আছে শঙ্খ ঘোষের *প্রহরজোড়া ত্রিতাল* বইতে। *কবিতার মুহূর্ত*-র পাঠক জানেন, উদ্‌বাস্তু জীবনকে দেখা আর বহন করার অভিজ্ঞতা কীভাবে কবিকে নিয়ে গিয়েছিল 'উল্টোরথ'-এর মুহূর্তে। সেই মুহূর্ত থেকে কবিতা যখন তার পূর্ণ অবয়ব পেল, তখন পরবাসীর বেদনা, নিজবাসেই দিশাহারা যে পরবাসী, তার নিরালম্ব বেদনা দেশভাগের প্রত্যক্ষ অভিঘাত পেরিয়ে ছড়িয়ে গেল সমাজ-ইতিহাসের স্তরে-স্তরান্তরে। ওপার বাংলার পাক্‌শি কি বাণারিপাড়া বা সন্ধ্যা নদীর তট থেকে এপারে কলকাতার কলেজস্ট্রিট-কলাবাগান-শম্ভু চ্যাটার্জি স্ট্রিটের যাত্রাপথে যে উচ্ছিন্নতার বোধ, তার মূর্তি ছিল বাইশ বছরের কবির 'দেশান্তর' কবিতায়। জীবনভর ওই বোধের বিচিত্র প্রক্ষেপ বিছিয়ে গেছে তাঁর সৃজনে। সার্থক কবিতার নিয়মেই সেসব সৃজন কবির প্রত্যক্ষ বিষাদ-যন্ত্রণা পেরিয়ে একাকার হয়ে গেছে নানা পাঠকের নানা ভাবনায়, নানা ইচ্ছায়, নানা উপশমে। 'উল্টোরথ' যখন বলে,

> সবার কাছে লাথি খাবার পদ্মবুকে
> দেশ নেই যার ওই ভাবে দেশ খুঁজে বেড়ায়
>
> উল্টোরথের ভিখারি দেশ খুঁজে বেড়ায়
> গলায় পাথর বুকের নিচে বৃহস্পতি।
>
> (প্রথম প্রকাশ: 'বারোমাস', শারদীয় ১৯৭৮, পৃ-১১৪)

তখন চব্বিশ বছর আগেকার দেশান্তরী নৌকোযাত্রা যেন অনেক পোড়-খাওয়া 'উল্টোরথ'-এর অজস্র উপাদানের, অগুনতি দ্যোতনার একটিমাত্র। কত পাঠক নিজের নিজের বিচিত্র সব

ত্রিশঙ্কু ব্যথা-বেদনার শুশ্রূষা পেলেন, নিরাশ্রয়ের তল পেলেন 'উল্টোরথ'-এ।

'দেশান্তর'-এর প্রত্যক্ষ ধ্বনি-বর্ণে-গন্ধে মাখামাখি ছড়াকবিতাগুলি কবির কাছে এল আরও পরে। তিনি নিজেই বলেছেন, 'এর অনেকটাই হলো আজকের দিনের অল্পবয়সের কাছে আমাদের কালের অল্পবয়সের কথা' (*বড়ো হওয়া খুব ভুল*); অথবা '... এসব লেখার অনেকটাই তো ছোটোদের সঙ্গে বড়োদের টুকটাক কিছু সংলাপই' ('সূচনাকথা', *বল্ তো দেখি কেমন হতো*)। যাদের মা-বাবাদেরই জন্ম দেশভাগের এক-দেড়-দুই দশক পরে, তাদের কাছে কেন ফিরে ফিরে নিয়ে আসা ভাঙা দেশের যন্ত্রণা? এতদিনের দেশ হঠাৎ করে পরদেশ হয়ে যাওয়ার বেদনাগাথা? তারা, একুশ শতকের গোড়ায় যারা *সুপুরিবনের সারি* -র নীলুর সমবয়সি বা আরও কম বয়সি, তারা কি খুঁজতে পারে ওই যন্ত্রণার তল-অতল? তাদের কাছে কোন অর্থ পায় ইতিহাসের সেই নিরুপায় বঞ্চনা? পূর্বপুরুষের স্মৃতিমেদুরতার অগাধ বেদনা কি ধরা দেয় তাদের পাঠপ্রতিক্রিয়ায়? দিতে পারেও বা, এমন পারঙ্গমতায় আস্থা রাখাই বুঝি সার্থক কবির ধর্ম। এই ধর্মের কথাই হয়তো বলেছিলেন শঙ্খ ঘোষের অগ্রজ এক কবি একেবারে ভিন্ন বয়ানে: 'আমাদের চোখ মায়ায় আচ্ছন্ন, আমরা বুঝি না, / ওর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-পড়া দাদু কিন্তু ওকে অনেক বেশি বোঝেন'। (মণীন্দ্র গুপ্ত, 'গোকুলে' *নমেরু মানে রুদ্রাক্ষ, কবিতাসংগ্রহ*, আদম, ২০১১, পৃ-২০৪)।

বাইশ বছরের কবি লিখেছিলেন, 'কোন দেশে রে মাঝি সাহেব কোন দেশেতে টান/ সেই দেশও কি আমারই দেশ, সেই

দেশও কি প্রাণ?' কিংবা, 'শব্দে ভরে এ-পার ও-পার, গন্ধে ভরে প্রাণ—/ কোন দেশে রে মাঝি সাহেব কোন দেশেতে টান?' জীবনের প্রায় সাত দশক অতিক্রান্ত কবি দুই প্রজন্ম পরের পাঠক-পাঠিকাদের জন্য লেখেন, '...কোন্‌খানে কোন্ কোণে/ রইল পড়ে টান আমাদের রইল পড়ে প্রাণ'। উপহার দেন একালের অল্পবয়সকে:

এদেশ যদি আগলে রাখো
সতেজ রাখো প্রাণ
হারিয়ে-যাওয়া সুরের যদি
ফিরিয়ে আনো রেশ—
এলাচগন্ধী বাতাস তোমায়
জানাবে আহ্বান
নিত্যনতুন হবে তোমার
খুব পুরোনো দেশ।

('উপহার', ওই)

'দেশান্তর'-এর প্রাণ আর টানের দ্যোতনা কি আধ-চেনা আধ-অচেনা কোনো মন-কেমন তৈরি করে 'পানসুপুরি', 'চামে-কাটা দেশ' বা 'বাড়ি'র পাঠকদের জন্য? পূর্বপুরুষের হারিয়ে-যাওয়া দেশের জন্য? এ-পাঠক পাক্‌শি-বাণারিপাড়া চেনে না, চেনে না সন্ধ্যা নদী, জানে না তারা ঠাকুরদাদার মঠ, জানে না, কাকে বলে 'যাত্রা করা', জানে না যে, *সুপুরিবনের সারি*-র শুরুতে শেষ হয়ে যেত গ্রামের সীমানা। একুশ শতকে অভ্যস্ত সচরাচর যাপনে তাদের সব পাওয়ার অন্তরালে কোথাও যেন আছে, সেকালের না-মেটা সাধের কোনো মুখবন্ধ কৌটো। তার ঢাকনি খুললে, বেজে ওঠে সেই আখ্যান না-ভোলার ব্যথা। বিষণ্ণ সেই আখ্যানের

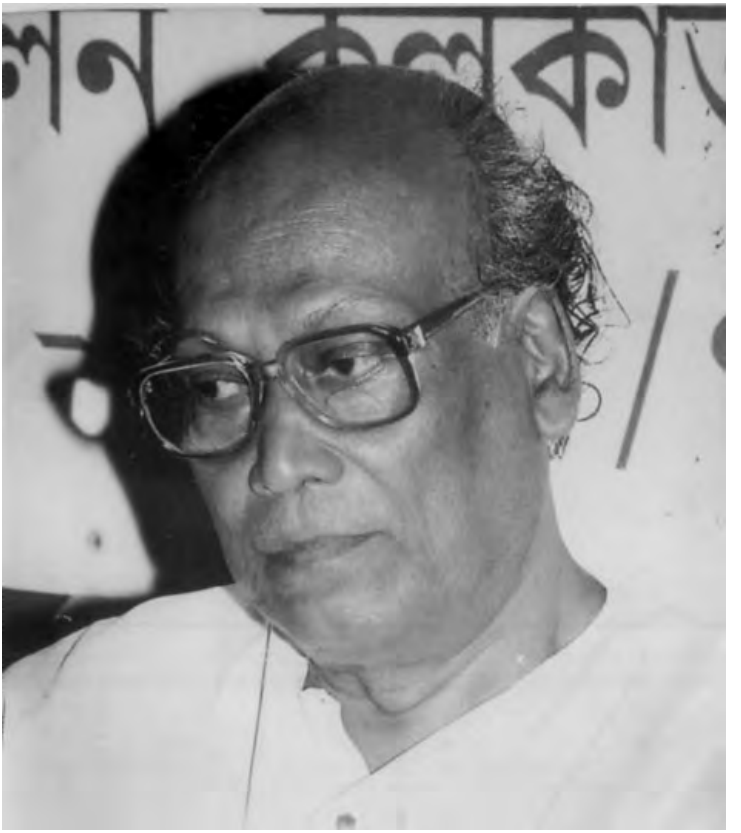

টুকরো-টাকরা যদি রূপকথা-নয়-এর আদলে, ঠাকুরদাদার ঝুলি কি দাদামশায়ের থলের কোনো এক বিকল্প চলনে মূর্ত করা যায়, তবে কি সেই সাবেককেলে ব্যথার খানিক উপশম মেলে?

'দেশান্তর'-এর সদ্যযুবক কবি পরিণত বেলায় হয়তো সেই উপশমই খুঁজেছিলেন নতুন দিনের অল্পবয়সের কাছে পুরনো দিনের কথা উজাড় করে।

কবির ৭৫তম জন্মদিনে প্রকাশিত পুস্তিকা থেকে ছবিগুলি ব্যবহার করা হল

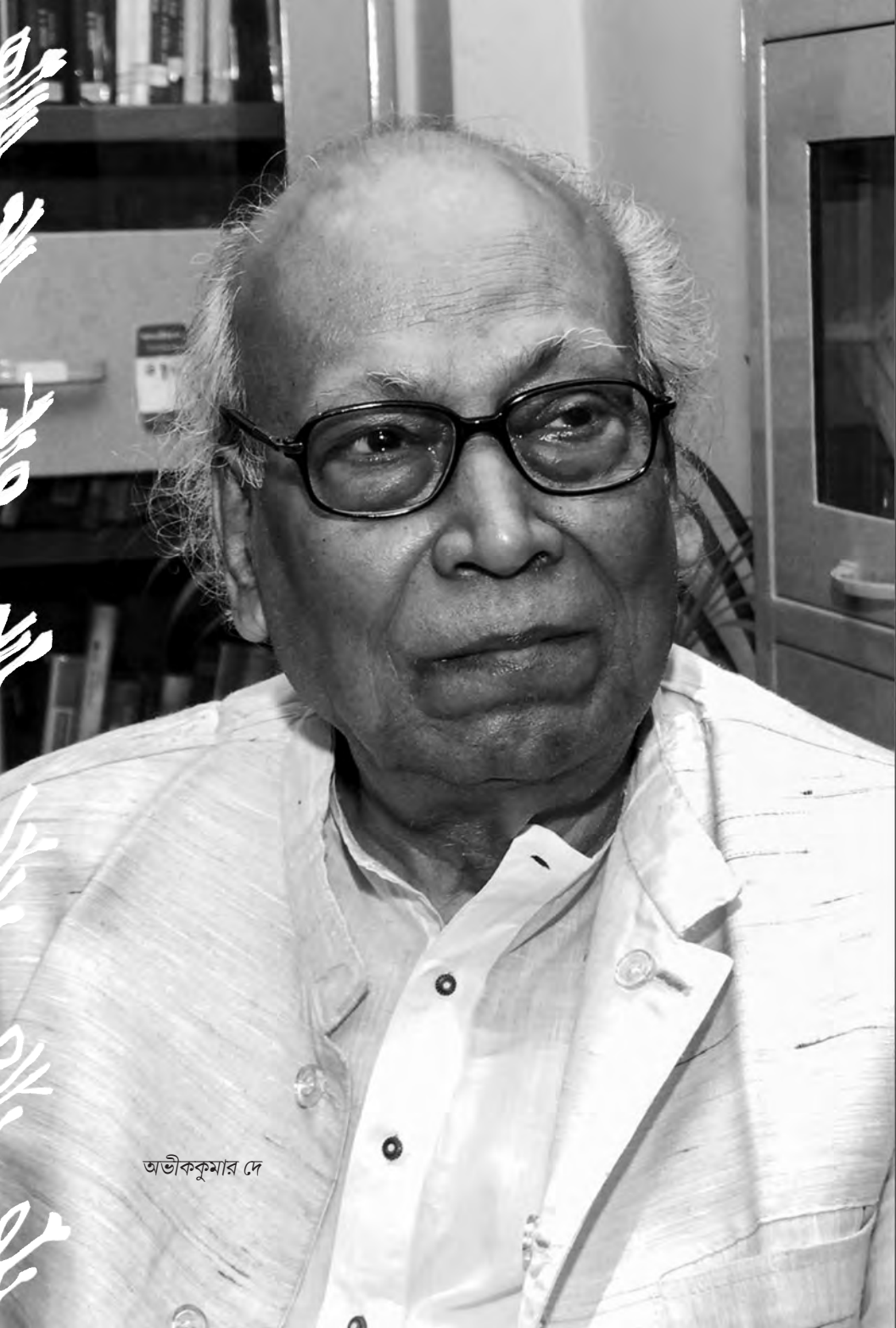

অভীককুমার দে

অভীককুমার দে

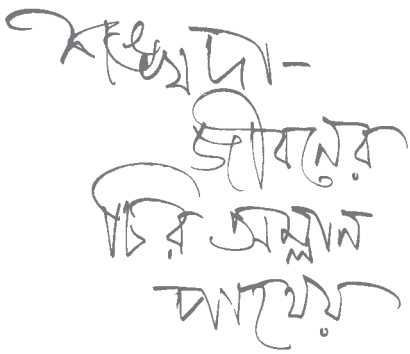

সময়টা উনিশশো উনসত্তর পুজোর ছুটির পর ইস্কুল খুলেছে। সাতদিনও হয়নি কালীপুজো গেছে, সদ্য কৈশোরে পৌঁছনো উঁচু ক্লাসের ছেলেদের পকেটে আতসবাজির মজুত থাকাটা কিছু অস্বাভাবিক ছিল না সেকালে মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের পড়তে যাওয়া ইস্কুলে। পুজোর ছুটিতে ঘটে যাওয়া কাহিনিগুলো সহপাঠীদের সঙ্গে বিনিময় করতে করতে চমক দিচ্ছিল বাড়ির বড়োদের সঙ্গে বা নিজেই যেসব আতসবাজি বানিয়ে ফেলা গেছে সেসবের অত্যুজ্জ্বল বিবরণ। আর হাতেগরম সেসব কৃতিত্বের

প্রমাণ না-দিতে পারলে কি গল্পটা মানানসই হয় বা বিশ্বাসযোগ্যতা পায় নাকি! যেমন ভাবনা তেমনই কাজ থেকে ইস্কুলের মাঠে পরীক্ষা প্রার্থনীয় ঢঙয়ে চারতলার বারান্দা থেকে প্রয়োগ করা হল একটি চকোলেট জাতীয় বোম। ব্যস, সেই আওয়াজে হৈ হৈ পড়ে গেল, সব ক্লাস থেকে ছেলেরা বারান্দায় হাজির, রটে গেল ইস্কুলের ছাদে লাল পতাকা উড়ছে। বাস্তবিক লাল-নীল কোনো পতাকাই কোথাও ছিল না প্রত্যক্ষদর্শীও মেলেনি।

পরের দিন ইস্কুলের সামনে গিয়ে দেখা গেল গেট বন্ধ! এ-রকমটি তো আগে কখনও দেখিনি। ইস্কুল আর দেশপ্রিয় পার্কের ব্যবধান ঘুচে গেছে ছাত্রদের জমায়েতে নিস্তব্ধ হতবাক সবাই, একী, এও সম্ভব, এটা কি হতে পারে! দেখা গেল গেটের ওপারে ব্ল্যাক বোর্ডে বিজ্ঞপ্তি 'অনির্দিষ্টকালের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ রাখা হল'। আর ক'দিন পরেই বার্ষিক পরীক্ষা তার কী হবে? এসব নানা ভাবনা আর বিবিধ উত্তেজনাকর খবরের মধ্যে দিনগুলো পার হচ্ছিল। মাঝে মাঝে ইস্কুলের গেটের সামনে যাওয়া যদি খোলার আয়োজন হয়, একদিন সব জল্পনার অবসান ঘটল, সেই ব্ল্যাক বোর্ডই জানাল, 'সকল ছাত্রকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করা হল'। হা হতোস্মি, এ কী! স্কুলজীবনের এখানেই সমাপ্তি— তবু হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষাটা দিতে পেরেছিলাম এবং পরবর্তীকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু-একটি পরীক্ষাও।

এই বছর তিনেকের দীর্ঘ ফাঁকা সময়টা অনেকটাই ভরাট হয়ে উঠছিল পাঠ্যবইয়ের বাইরের নানা বিষয়ের বই পড়ে। এবার আর দৈনিক পত্রিকায় শুধুই খেলার খবর নয়, ক্রমশ অন্য সব গুরুগম্ভীর রাজনৈতিক খবরে চোখ পড়তে লাগল, কিছু

বা তার বুঝি কিছু বা বুঝি না। খানিকটা খানিকটা যেন বুঝতে পারছিলাম দেশ কী এক অশান্ত সময়ের মধ্যে দিয়ে চলছিল। বাড়িতে বড়োদের মধ্যে নানা রাজনৈতিক তর্কবিতর্ক শুনেছি। সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে নৈরাজ্যের বিস্তার তখন, ক্রমে ক্রমে আবছা হলেও তার একটা ছবি ধরা দিচ্ছিল। নিত্যকার খবর ইস্কুল-কলেজের ল্যাবরেটরি লাইব্রেরিগুলো তছনছ করা হচ্ছে, কখনও মানুষ শিউরে উঠে দেখছে প্রকাশ্য স্থানে সুদীর্ঘকালের

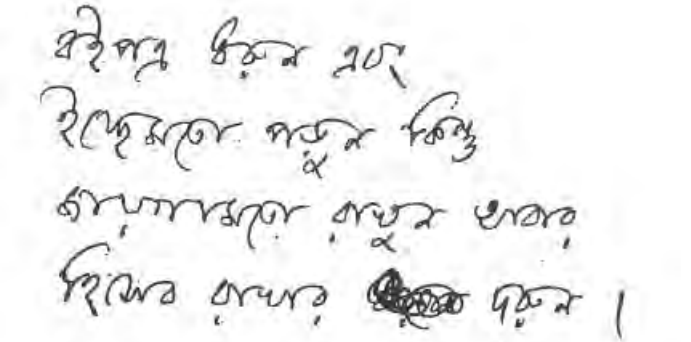

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ আয়োজিত
বাংলা লিটল ম্যাগাজিন (১৯৫০-১৯৮১)
প্রদর্শনীর (১৯৮১) পোস্টারের জন্য শঙ্খ ঘোষের লেখা পোস্টার-কবিতা।

পরিচিত মনীষীমূর্তিগুলি কাদের পরুষহস্ত খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলে দিয়ে গেছে। দুই রাজনৈতিক দলের হানাহানিতে কখন যে শহরের কোনো অঞ্চল অগম্য হয়ে উঠবে কেউ বলতে পারে না। আর সেই সব বীরদের পরাক্রম বোধকরি সবচেয়ে ফলবান হয়ে ওঠে ট্রাফিক পুলিশ হননে। কোনো হঠকারিতা প্রবাদপ্রতিম শিক্ষক উপাচার্য গোপালচন্দ্র সেনকে হত্যা করল তাঁর নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে। সারা বিশ্ব স্তম্ভিত! পরের বছর কলকাতা একাত্তর, দিনদুপুরে নৃশংসভাবে কয়েকটি তরুণের হাতে খুন হলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান জননেতা হেমন্তকুমার বসু। 'অশ্রু ভরা বেদনা'য় ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল বাংলার বাতাস। একটা যে বেয়াড়া ধরনের সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছি আমাদের কাছেও যেন অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। বাংলা আর লাগোয়া কিছু অঞ্চল অতি বামেদের অকাল বিপ্লবের ডাকে এক আতঙ্কের চাদরে ঢাকা। চারদিকেই একটা থমথমে আবহাওয়ার মধ্যে মোড়া দিনগুলো কাটছিল।

বহুকালের ছবি তোলার নেশাটাও সেসময়ে আমাকে পেয়ে বসেছিল। কিছুদিনের মধ্যেই নেশার সুত্র ধরেই চাকরি জীবনে প্রবেশ, পাড়ি দিলাম আন্দামান। শুরু হল আর এক নির্বাসিতের জীবন। অফিসের সময়টুকু ছাড়া প্রায়শই সঙ্গীবিহীন দীর্ঘ অবকাশ ভরে উঠত সেই অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রাজত্বে ঘুরে বেড়িয়ে আর নিবিষ্ট করে রাখত নানা স্বাদের সাহিত্য। আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গেও পরিচয় হল কিছু বুঝতাম কিছু-বা অধরাই থেকে যেত। বোঝা-না-বোঝার আলোআঁধারই পথে নিজের অনুভবই সব ছিল, বুঝিয়ে দেওয়ার তো কেউ ছিল না।

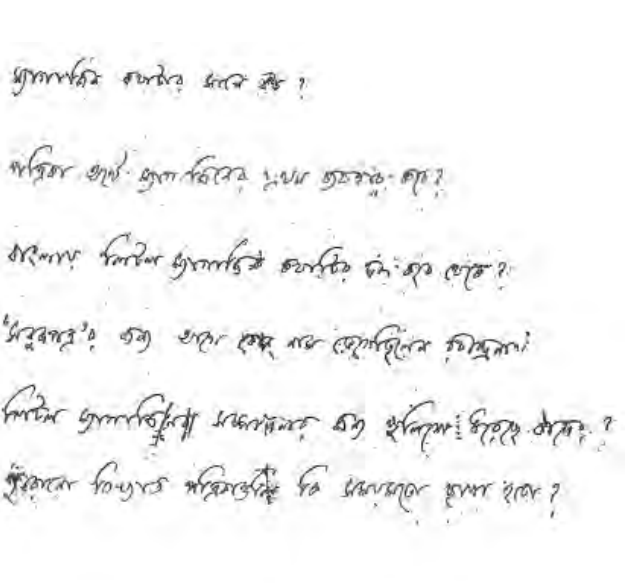

The publication of one single poem, even in handscript does in the long run alters a culture.

Allen Ginsberg

To the general lowering of the status of literature and of the interest in it, the innumerable *little magazines have been a natural and heroic response.

Lionel Trilling

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ আয়োজিত
বাংলা লিটল ম্যাগাজিন (১৯৫০-১৯৮১)
প্রদর্শনীর (১৯৮১) পোস্টারের জন্য শঙ্খ ঘোষের বয়ান।

আকর্ষণের একটা বড়ো অংশের দখল নিয়েছিল রবীন্দ্রসাহিত্য। ক্রমশ রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠিপত্রেরও কিছু কিছু পরিচয় পেলাম আর তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে আরও জানার একটা কৌতূহল আমার মনে নিরবধি কাজ করেছে। চাকরির সুত্রে আমাকে ভারতের প্রায় সর্বত্র ঘুরতে হয়েছে বদলিও হতে হয়েছে নানান অঞ্চলিক কেন্দ্রে। যখনই যেখানে গেছি সেই অঞ্চলে রবীন্দ্রনাথ গিয়ে থাকলে কোন কোন স্থানে কখন কী উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন সেসব সন্ধানে মন ব্যাপৃত থাকত, ছবিও তুলতাম।

রবীন্দ্রসৃষ্টিতে বহুধা বিস্তৃত অলংকরণ ছড়িয়ে আছে নানান গ্রন্থে, সাময়িক পত্রিকা এবং অনুষ্ঠানপত্রীতে। বহু নামি অনামি শিল্পী তাঁর লেখার সঙ্গে ছবি এঁকেছেন, কখনো লেখকের বা সম্পাদকের অনুরোধে। আবার স্বয়ং লেখকও নিজের লেখাকে কত বিচিত্রভাবেই না চিত্রিত করেছেন আপন খেয়ালে। কবিতা-গান রচনাকালে রদবদলের ছলে আর এক স্রষ্টা মন তাঁর মেতে উঠেছে। এক সময় রবীন্দ্রসৃষ্টির অলংকরণ বিষয়ে নিয়ে ভাবনা আমাকে মাতিয়ে তুলেছিল। আর সেই সুত্র ধরেই রবীন্দ্রসৃষ্টির অলংকরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে সে-বই যে শঙ্খ ঘোষের মতো মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এ তো আমার কল্পনার অতীত। সংবাদপত্রে সেই বই-এর আলোচনাও করলেন তিনি। তবু তখনই যে তাঁর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছিল তা নয়। এসবেরও বেশ অনেকদিন পরে শঙ্খদার সঙ্গে আমার পরিচয়। একটু সংকোচের সঙ্গেই গিয়েছিলাম, আমি তো সাহিত্যের ছাত্র নই, তাঁর তো নইই। শঙ্খদাও কোনোদিন সেসব কিছু বিচার

করেননি। তবু কী করে এই মানুষটির সঙ্গে আমার এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সেকথা ভেবে অবাক হই।

রবীন্দ্রজীবনকে তাঁর এবং তাঁর পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিলিয়ে যখন স্মৃতির ছবি করার কল্পনায় মন বিভোর এবং বেশ খানিকটা কাজ এগিয়েছে মাঝে মাঝে গেছি তাঁর কাছে, দেখিয়েছি কী করছি, কতটা হল। এখনও ভাবলে বিস্মিত হই, কী পরম ধৈর্যে দেখতেন পাণ্ডুলিপির প্রতিটি পৃষ্ঠা, কখনও কয়েকদিনের জন্য রেখেও দিয়েছেন আবার সুযোগ মতো ডেকে নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। অল্প কথায় কিছু মন্তব্য করেছেন, কখনো-বা প্রশ্ন। আমার দৃষ্টিকে তা প্রসারিত করে দিয়েছে প্রতিনিয়ত। 'গোলেবকাওলি' আমি একটু ভিন্ন উচ্চারণে লিখেছিলাম। জানতে চাইলেন, "বইটা কি তুমি দেখেছ?" পালটা জানতে চাইলাম উনি কেন একথা জিজ্ঞেস করছেন। জানালেন তাঁর দেখা বইটির নাম ছিল 'গোলেবকাওলি'। আর আমি কী বলব! বইটা তো আমি দেখিনি, কোনো বইতে তার উল্লেখ যেমনটি ছিল সেটাই ব্যবহার করেছিলাম। সেকথা জানাতে বললেন, "ও বইতে কিছু ছাপার ভুল আছে"। আজ লিখতে বসে মনে পড়ছে এক জায়াগায় লিখেছিলাম 'হাঁসপাতাল', একটু হেসে বললেন, "তুমি কি এপার বঙ্গের?" উত্তরটা সদর্থক ছিল সদর্থকই হল, আর চন্দ্রবিন্দুটা বাদ গেল। লক্ষ করেছি তিনি কখনই 'এটি ভুল' বলতেন না, বলতেন, "আচ্ছা এই বিষয়টা কি আমরা এভাবে ভাবতে পারি?"

স্মৃতির ছবি-র প্রথম খণ্ডের প্রাক্‌প্রকাশ পর্বে প্রকাশক বইটি সম্বন্ধে কয়েকজন রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞের মতামত সংগ্রহ করতে

চাইলেন। স্বভাবতই সব আগে শঙ্খদার দ্বারে গিয়ে দাঁড়ালাম। অনায়াস ঔদার্যে তিনি যা লিখে দিয়েছিলেন, পাঠক দয়া করে একে আমার আত্মপ্রচার ভাববেন না, এ আমার জীবনের পরম প্রাপ্তি।

"রবীন্দ্রনাথের একটি চিত্রজীবনী কেন আজও নেই? তেমন একটি জীবনী রচনার অজস্র উপাদান তো ছড়িয়ে আছে আমাদের চারপাশে। বিশ্বভারতীর মতো কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে তাকে

'স্মৃতির ছবি'-র প্রথম খণ্ড প্রসঙ্গে কবির মতামত

সংকলিত করে তুলবার একটা আয়োজন কেন হয় না? আমারই মতো আরো অনেকের মনে এ-রকম প্রশ্ন হয়তো জেগেছে নানা সময়ে। এমনই একটা অভাববোধ থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত চেষ্টায় বহুপ্রতীক্ষিত সেই চিত্র জীবনী গড়ে তুললেন শ্রীঅভীককুমার দে। সম্পূর্ণ জীবন নয়, এখানে অভীক পৌঁছতে পেরেছেন কবির মাত্র চল্লিশ বছর বয়সের কাছে। তাঁর কল্পনা আছে, গবেষকের যোগ্য শ্রম আর নিষ্ঠা আছে, সর্বোপরি আছে এমন একটি কাজের জন্য প্রত্যাশিত ভালোবাসা। 'রবীন্দ্রসৃষ্টির অলংকরণ' নামের একটি বই উপহার দিয়ে এর আগে তিনি পাঠক সমাজের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। পাণ্ডুলিপিস্তরে এ-বইটিকে দেখে আমি নিশ্চিত যে এর প্রকাশের পর আমাদের সেই কৃতজ্ঞতাবোধ বেড়ে যাবে অনেকখানি।"

আগেই বলেছি কর্মসুত্রে আমাকে দেশের প্রায় সর্বত্র যেতে হয়েছে, রওনা হওয়ার আগে অফিসের করণীয় বিষয় জেনে নেওয়ার পাশাপাশি সে-স্থানের ভৌগোলিক বিবরণ, আবহাওয়া, ভাষা, আচারআচরণ, ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে মনের সুরে অন্য তার বাঁধা চলত, সেখানে কি কোনো সময়ে রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন? যদি কখনো গিয়ে থাকেন তাহলে কোথায় কতদিনের জন্য ইত্যাদি বিষয়ের খবরাখবর। এরকম ভাবে কাজের দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত কৌতূহল যে কত মিটিয়েছি, সেও যেন আর এক ইতিহাস। পথে চলার আনন্দে কুড়িয়ে আনা রবীন্দ্রজীবনের নানান অজানা মণিগুলি ঝুলি থেকে কখন মেলে ধরব তাঁর সামনে সেজন্য অপেক্ষায়

To whom it may concern

This is to certify that Sri Ablikkumar Dey has been intimately known to me for more than a decade. I had the privilege of knowing him as a genuine and energetic scholar, being engaged all the time in some sort of intellectual quest. Of all the scholarly works he has published so far, undoubtedly the most important one is a pictorial biography of Rabindranath Tagore, both in Bengali and English, with detailed annotations. This biography however has been done only partly (first forty years of the Poet's life) and Ablik as well as the readers like me would like the project to be completed as soon as possible. Naturally he needs some time (and perhaps some monetary help also) to continue this worthwhile work. He can now be treated as a serious Tagore scholar and I wish him all success not only in this particular project but in his other future ventures also.

A1/6 Iswarchandra Vihar
Kolkata 700 054

Sankha Ghosh
September 8, 2010.

কবির স্বহস্তে লিখিত লেখকের পরিচয়পত্র

থাকতেন হাজারদুয়ারির বাসিন্দা শঙ্খ ঘোষ। পিঠাপুরমের রাজার কুন্নুরের অতিথিনিবাস 'রোজ ভিলা' যেখানে বাতাস আজ গোলাপের গন্ধ উড়িয়ে নিয়ে যায় না ভরে আছে সবুজ চা বাগানের গালিচায়। এখানেই সুচনা হয়েছিল 'শেষের কবিতা'র। শিলঙে 'যোগাযোগ' লেখা শুরু করেছিলেন যে বাড়িতে, সে বাড়ি আর নেই, রাস্তার ধারে পাথরের বুকে খোদাই করা আছে তথ্যটি। শিলঙে আর একবার গিয়ে *রক্তকরবী* লিখেছিলেন 'জিৎভুমি'তে অবস্থানকালে, সে-বাড়ি এখনও আছে বলেই জানি। কারোয়ারে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সরকারি বাসস্থান আজও সেরকমটিই আছে বর্তমান কারোয়ার জেলার জেলাশাসকের আবাস হয়ে। *জীবনস্মৃতি*-র পাঠক জানেন যুবক রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু আনন্দের দিন কেটেছিল সেখানে। কাশ্মীরের 'মার্তণ্ড' মন্দির দর্শন অভিলাষও পূর্ণ করেছেন। ভারতের আরও কত স্থানে নানা উপলক্ষ্যে আমন্ত্রিত হয়ে গেছেন তিনি, বিশ্বভারতী পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করতেও গেছেন, গেছেন সেই পরিকল্পনা রুপায়ণের অর্থ সংগ্রহমানসে। 'রামগড়' 'আলমোড়া' হয়ে আমাদের রাজ্যের 'দার্জিলিং' 'কার্শিয়ং' 'মংপু' 'চন্দননগর' প্রভৃতি কত জায়গাতেই তাঁর গমনাগমন। সেসব স্থানে যে-আবাসগুলিতে তাঁর দিন কেটেছে, সেসব বাড়ির বিবরণ শঙ্খদাকে শোনাতাম তুলে আনা ছবি দেখাতাম আগ্রহভরে শুনতেন এবং ছবিগুলি দেখতেন। নিজের দেখা জায়গাগুলির কথাও বলতেন। কয়েকবছর আগে পুজোর সময়ে সপরিবারে উত্তরভারতের ডালহৌসি পাহাড়ে গিয়েছিলেন, ইচ্ছে ছিল পিতা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বালক রবীন্দ্রনাথ যে-

বাড়িটিতে থাকতেন সেখানে যাওয়া। বাড়িটিতে যেতে পারেননি, সেটি এখন সেনাবাহিনীর এলাকার মধ্যে, সাধারণের প্রবেশ নিষেধ।

চিত্রজীবনীর জন্য নানা প্রতিষ্ঠান থেকে উপকরণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কাজের এবং আমার একটি পরিচয়জ্ঞাপক পত্রের প্রয়োজন ছিল। শঙ্খদার কাছ থেকে সেটির প্রত্যাশা জানাতে বললেন, "আমার কোনো ছাপানো লেটার প্যাড তো নেই। হাতে লিখে দিলে তোমার কাজ হবে।" একটু বসো, বলে ভেতরের ঘরে গিয়ে মিনিট পনেরো-কুড়ি পর ফিরে স্বহস্তে লেখা পরিচয় পত্রটি দিলেন:

To whom it may concern

This is to certify that Sri Abhikkumar Dey has been intimately known to me for more than a decade. I had the privilege of knowing him as a genuine and energetic scholar, being engaged all the time in some sort of intellectual quest. Of all the scholarly works he has published so far, undoubtedly the most important one is a pictorial biography of Rabindrnath Tagore, both in Bengali and English, with detailed annotations. This biography however has been done only partly (first forty years of Poet's life) and Abhik as well as readers like me would like the project to be completed as soon as possible. Naturally he needs some time (and perhaps some monetary help also) to continue this worthwhile

work. He can now be treated as a serious Tagore scholar and I wish him all success not only in this particular project but in his other future ventures also.

Sankha Ghosh

A1/6 Iswarchandra Nibas
Kolkata 700 054
September 8, 2010

শঙ্খদার দেওয়া পরিচয় পত্রের সুত্র ধরে এক অভাবনীয় অভিজ্ঞতা হয়েছিল বাঙ্গালোরের কর্ণাটক সাহিত্য একাদেমিতে গিয়ে। প্রথামাফিক একাদেমির সম্পাদককে পরিচয় পত্রের চিত্র প্রতিলিপি পেশ করলাম। লক্ষ করলাম তিনি অনেকক্ষণ ধরে বারবার সেটি পড়তে লাগলেন। তারপর আমার কাছে জানতে চাইলেন— আমি সাহিত্যের ছাত্র কিনা, আমি কি শঙ্খ ঘোষের ছাত্র, আমার পেশা ইত্যাদি নানান প্রশ্ন। আগ্রহ ভরে জিজ্ঞাসা করলেন মূল পরিচয় পত্রটি সঙ্গে আছে কিনা। আমি সহজ ভাবেই বলেছি 'অবশ্যই' এবং ব্যাগ থেকে বার করে তাঁর হাতে দিলাম। নিবিষ্ট চিত্তে সেটি আবার পড়লেন তারপর বারবার কপালে ঠেকাতে লাগেলন। বলতে লাগলেন, "তুমি কী ভাগ্যবান, তুমি কী মহাগুরু পেয়েছ, তুমি শ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক পেয়েছ।" আমি বিস্মিত হয়তো-বা তাঁরই মতো অভিভূত। *স্মৃতির ছবি*-র কাজ শেষ পর্যন্ত অসমাপ্ত রয়ে গেল, সে আমার দুর্ভাগ্য।

শঙ্খদার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত যোগাযোগ হারায়নি। নতুন এক কাজের দায়িত্ব পেয়েছিলাম তাঁর কাছ থেকে। কয়েক বছর আগে— দু-হাজার আঠারোর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি আমাকে অকাল প্রয়াত প্রশান্তকুমার পালের *রবিজীবনী*-র অসমাপ্ত দশম খণ্ড সম্পূর্ণ করবার ভার দিয়েছিলেন। যে-পাণ্ডুলিপি তাঁর কাছে ছিল সেটি বইটির অসম্পূর্ণ খসড়া মাত্র। দশম খণ্ডের নতুন পাণ্ডুলিপি নিয়ে বেশ কয়েকবার তাঁর কাছে গেছি দীর্ঘ সময় ধরে সেটি তাঁকে পড়ে শুনিয়েছি, তিনি নিজেও গভীর মনোযোগে পড়েছেন সেটি, নানা প্রসঙ্গের আলোচনাও হয়েছে। ইতিমধ্যে ক্রমেই যে তাঁর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হচ্ছিল সে আভাস পেতাম। জানুয়ারি

দু-হাজার একুশে যেদিন *রবিজীবনী* দশম খণ্ডের সংশোধিত এবং পরিবর্ধিত পাণ্ডুলিপি তাঁর কাছে নিয়ে গেলাম, কয়েকদিনের জন্য সেটি রেখে দিলেন। ছোটো একটি ভূমিকা লিখে দেবার ইচ্ছা ছিল তাঁর। জীবন থেকে শঙ্খদাই হারিয়ে গেলেন সে তুলনায় প্রত্যাশিত তাঁর সেই ছোট ভূমিকাটি না পাওয়ার বেদনা বরং সহনীয়।

শুরু করেছিলাম উনিশশো উনসত্তরের পর্যুদস্ত সময়ের কথা দিয়ে। পঞ্চাশ বছর পরে এখন আর এক বিপর্যস্ত সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি আমরা। তবে এবার সে বিশ্বজুড়ে অকাল হননের আতঙ্ক নিয়ে হাজির হয়েছে, 'কোভিড উনিশ'। একের পর এক পথ-দেখানো আলোকস্তম্ভগুলি নিভে যাচ্ছে চিরতরে। জীবন গাঢ় থেকে গাঢ়তর অন্ধকারে ডুবছে প্রতিনিয়ত। শঙ্খদাও চলে গেলেন, অকূলদরিয়ায় ভাসমান আমাদের শেষ 'লাইট হাউস'।

ছবি: লেখক

ছবি: দীপঙ্কর দাশ

মুজিবর রহমান

মৃদুস্বর, মৃদুভাষা, মৃদুহাসির অবয়বে
এক প্রকাণ্ড তেজদীপ্ত পৌরুষ

মৃদুস্বর, মৃদুভাষা, মৃদুহাসি—তাঁর চরিত্রের হাজারো বৈশিষ্ট্যর মধ্যে অন্যতম, একথা হয়তো তাঁর সান্নিধ্যধন্য অনেকেই বা বেশিরভাগই বিশ্বাস করবেন। কিন্তু তাঁর মৃদুআলয়ে ছিল এক তেজদ্বীপ্ত পৌরুষ যা পরখ করেছেন দেশবাসী। বহুবার। ছোটো ছোটো ব্যাক্যে তিনি প্রকাশ করতেন তাঁর কথা কিন্তু তার ভাব ও অর্থ হত বড়ো বড়ো বা বৃহৎ। একটা উদাহরণ দেওয়া এখানে জরুরি। একবার আমি ওঁর সঙ্গে গোর্কিসদনে গেছি। ওঁর পাশে বসেই কতকগুলো তথ্যচিত্র দেখেছিলাম। তথ্যচিত্রগুলো ছিল

রবীন্দ্রনাথের কাব্য, সংগীত ও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর। সরকারিভাবেই নির্মিত ছবিগুলি। দীর্ঘ প্রদর্শনী শেষ হওয়ার পর যথারীতি তথ্যচিত্রের প্রযোজক ও পরিচালকগণ ধরলেন ওঁকে কিছু বলার জন্য; যথেষ্ট অনুনয় বিনয়। কিন্তু মৃদু হাসি দিয়ে উনি বোঝালেন যা বোঝাবার, আমাকে ইশারা করলেন এগুতে। আমি ওঁকে অনুসরণ করলাম। দীর্ঘ করিডর মৃদু পায়ে অতিক্রম করে গাড়িতে এসে বসলেন। ইশারায় হুকুম হল। গাড়ির পিছন দরজা খুলে আমিও বসলাম ওঁর পাশে। আয়োজক ইত্যাদিরা বিনয় সৌজন্য ও হাসি দিয়ে ওঁকে বিদায় জানালেন। গাড়ি চলতে শুরু করল সন্ধ্যার শহরের রাস্তায়। আমি তো প্রায় বোবা হয়ে গেছি। শুধু ভাবছিলাম, কী হত ছবিগুলো সম্পর্কে দু-চার কথা বললে—ওঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগের সেটা প্রায় প্রভাতকাল; আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না ওঁকে। আমারও মনটা খুব আকুলি বিকুলি করছিল ওঁর কথা শুনবার। তথ্যচিত্রগুলো দেখে আমারও মনে কিছু প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছিল, ওঁর প্রতিক্রিয়া জানতে পারলে আমার খুব লাভ হত। এইসব সাতপাঁচ ভাবছিলাম, দেখলাম ওঁর স্বভাবসিদ্ধভাব—নির্লিপ্ত দৃষ্টি জানালার বাইরে। কিছু বলব সে সাহসও পাচ্ছিলাম না। কিন্তু একটা বেয়াড়া প্রশ্ন পেটের মধ্যে গুড় গুড় করছিল। তবে বেশিক্ষণ আর তা চাপা দিতে পারছিলাম না। গাড়িটা যখন সায়েন্সসিটি থেকে বাঁ-দিকে টার্ন নিয়ে বাইপাস ধরল আমি অপার সাহস সঞ্চয় করে পেটের মধ্যে চলতে থাকা গুড়গুড়ানিটা থামালাম। আমারও যেন স্বর অস্ফুট। ঘাড় ঘুড়িয়ে আমার দিকে তাকাতে জিজ্ঞেস করে বসলাম, “সকলে আপনাকে এত অনুরোধ করলেন, তথ্যচিত্রগুলোর ব্যাপারে কিছু বললেন

না কেন?" প্রত্যুত্তরে পরপর এল মৃদুহাসি, মৃদুস্বর ও মৃদু ভাষা, একটি ছোটো বাক্য, "কিছু না বলা কি অনেক বলা নয়"। আমার ভিতরে হঠাৎ আসা দমকা হাওয়া হঠাতই থেমে গেল। উনি আর একবার মৃদু হাসি আমার রক্তশূন্য মুখের উপর বুলিয়ে আবার জানালার বাইরে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন। আর ঐ ছোট্ট ব্যাক্যটি যেন ঝংকারের মতো বাজতে লাগল আমার সারা শরীরে। একটা ভাবনা দৃঢ় হল, মানে ওঁকে কিঞ্চিত বোঝা গেল—মৃদুস্বর, মৃদুভাষা, মৃদুহাসির অবয়বে এক প্রকাণ্ড তেজদ্বীপ্ত পৌরুষ যাকে আমরা শঙ্খ ঘোষ নামে জানি।

২০০৯-এর কোনো এক শীতের সন্ধ্যায় ওঁর সাথে আমার প্রথম আলাপ। তখন আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর একটা তথ্যচিত্র করব বলে ঠিক করেছি। পড়াশোনা ও ভাবনাচিন্তা অনেকটাই হয়ে গিয়েছিল। এ বিষয়ে ওঁর সাথে আলোচনা করতেই গিয়েছিলাম। প্রথমে সামান্য অবাক হলেন, বললেন সত্যজিৎ এই কাজটা করেছেন, তারপর আপনি করবেন। একটু ভালো করে ভেবে নিয়ে এগোলে ভালো হয়। আমি আমার মতো করে বোঝালাম, আমি যেটা বলেছিলাম, যতদূর মনে পড়ে, "স্যার, সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রনাথের জীবন নিয়ে ছবি করেছেন পঞ্চাশ বছর আগে, কবির জন্মশতবর্ষে আর আমি ভাবছি সার্ধশতবর্ষে। ভাবনা ও উপস্থাপনা হয়তো আলাদা হতেও পারে। আর তাছাড়া সত্যজিৎ রায় আমাদের মতো চলচ্চিত্র কর্মীদের কাছে আদর্শ। তাঁর কাজ দেখেই আমরা কাজ শিখি।" উনি ওঁর স্বভাবসিদ্ধভাবে নির্লিপ্ত থেকে মৃদুহাসি ছড়িয়ে দিলেন। আমি আশ্বস্ত হলাম। উনি জানতে চাইলেন আমি কিছু লিখেছি কিনা। আমি সাথে করে

Visuals		Voice over
যুবক রথীন্দ্রনাথ , নগেন্দ্রনাথ এবং সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের ছবি // যুবক এলমহার্স্ট // গ্রেচেন গ্রীন , ডঃ হ্যারি টিম্বার্স ও তাঁর স্ত্রী রেবেকা । বিশ্বভারতী সমবায় ব্যাঙ্ক		রবীন্দ্রনাথ নিজের পুত্র রথীন্দ্রনাথ, জামাতা নগেন্দ্রনাথ ও বন্ধুপুত্র সন্তোষ চন্দ্র মজুমদারকে আর্বনায় অবস্থিত ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি ও পশুপালন বিদ্যাশিক্ষার জন্য পাঠিয়ে দেন । যাতে তাঁরা পল্লী সংগঠনের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারেন । এই তিনজন কৃষিবিদ্যার পাঠ শেষ করে দেশে ফিরে শ্রীনিকেতনের কাজে যোগ দেন । রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শ্রীনিকেতনের কাজে যোগ দেন লেনার্ড এলমহার্স্ট নামে এক ইংরেজ আদর্শবাদী যুবক । যিনি আমেরিকার কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিবিদ্যার ছাত্র ছিলেন । পরবর্তীতে এখানে আসেন আমেরিকা থেকে গ্রেচেন গ্রীণ, ডঃ হ্যারি টিম্বার্স ও তাঁর স্ত্রী রেবেকা । স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আর্থিক উন্নতি ও সমাজকল্যাণ সম্পূর্ণ পুনর্বাসনের এই বিভিন্ন আয়োজন শ্রীনিকেতন কেন্দ্রের নির্দেশে পরিচালিত হত । ~~নোবেল পুরস্কারের টাকা দিয়ে~~ রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বভারতী সমবায় ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠা করেন । যাতে চাষিদের মহাজনের বকেয়া ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা হয় ।
সমুদ্রে জাহাজের ছবি / video footage । চীন ও জাপানে রবীন্দ্রনাথের ছবি । World map এ পেরু ও আর্জেন্টিনা highlight ।। রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর available ছবিগুলো ।। [illegible] 'পূরবী 'কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ এবং ওকাম্পোকে উৎসর্গীকৃত অংশ [illegible]	৫২)	১৯২৪ থেকে ১৯৩৪ - এই দীর্ঘ সময়ের বেশিরভাগ রবীন্দ্রনাথ বিদেশে কাটান । ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে গেলেন চীন ও জাপান । এই বছরের জুলাই মাসে আবার রওনা হলেন পশ্চিমে, দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর উদ্দেশ্যে । কিন্তু অসুস্থতার জন্য পেরুতে যাওয়া হয়নি তাঁর, তবে বেশ কিছুকাল কাটালেন দক্ষিণ আমেরিকার আর এক দেশ আর্জেন্টিনায় । আর সেখানে আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস আইরেস শহরে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো নামে এক মহিলার সান্নিধ্যে এলেন রবীন্দ্রনাথ । তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব হল আর সে বন্ধুত্ব অটুট ছিল বহুকাল । আর্জেন্টিনায় থাকার সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পুরবী' কাব্য[illegible] আর সেটি উৎসর্গ করেন তাঁর এই বিদেশিনী বন্ধুকে। রবীন্দ্রনাথ ওকাম্পোর নাম দিয়েছিলেন বিজয়া ।

আমার চিত্রনাট্যের প্রথম খসড়াটা নিয়ে গিয়েছিলাম। ওঁর হাতে দিলাম। উনি কয়েকটা পাতা চোখ বুলিয়ে বললেন, "সাত দিন পর ফোন করে এসো"। কথা শেষ হল। আমার মন আনন্দে ভরে গেল। বুঝলাম উনি আমাকে সহযোগিতা করবেন। মনে বেশ জোর পেলাম।

ঠিক সাতদিন পর ফোন করে ঈশ্বরচন্দ্র নিবাসে গেলাম। যথারীতি চা-জলখাবার খাওয়ার পর কাজ শুরু হল। সেদিন বসার ঘরে নয়, পাশেই বোধহয় ওঁর শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। পুরো স্ক্রিপ্টটা ওঁর হাতের লেখায় ভরা। সংশোধন করেছেন। এক এক করে বিষয় ধরে ধরে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন ত্রুটিগুলো। আমার মনের মধ্যে এঁটে বসে থাকা গাঁটগুলো ছাড়ল। না বুঝতে পারা অনেক কিছু আমি সহজেই বুঝতে পারলাম। কিছু কিছু বিষয় যেগুলো আমি বাদ রেখেছিলাম তার গুরুত্ব বুঝিয়ে উনি আমাকে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করতে বললেন। তারপর মৃদুস্বরে দুটো বাক্য, "কাজটা করো। প্রয়োজনে ফোন করে নিও।" আমি যেন আকাশের চাঁদ পেলাম হাতে। আর কী চাই! এরপর চায়ে চুমুক দিয়ে একটা প্রশ্ন অভিভাবকের মতো করলেন, "এই ছবি যে তুমি তুলবে টাকা পাবে কোথায়?" সত্যটা জানালাম ওঁকে। "কোথাও থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি নেই, নিজের উদ্যোগে শুরু করেছি— বাকিটা জানি না।" উনি বেশ অবাক হলেন, নিরুৎসাহ করেননি, বরং যে কয়েকটি কথা বললেন আমি যথেষ্ট উৎসাহিত হলাম। শুধু শেষ কথাটা মনে আছে, "উদ্যোগ থাকলে উপায় বেরিয়ে আসবে"। আমার মনের জোর সহস্রগুণ বেড়ে গেল। এরপর টানা তিন বছর লেগে থাকলাম ওঁর সাথে। যত দিন

গেছে আমার প্রতি ওঁর স্নেহ প্রশয় বেড়েছে। উনি যেন আমার আশ্রয় হয়ে উঠেছেন; কখন উনি আমাকে আপনি থেকে তুমি বলতে শুরু করলেন আমি বুঝতেই পারিনি। ওঁর সহধর্মিণীর সঙ্গে আলাপ হল। তিনিও ছিলেন বড়ো মমতাময়ী। ৫ ফেব্রুয়ারি স্যারের জন্মদিনে যখন শুভেচ্ছা জানাতে যেতাম তখন ওঁর ঘরেও একবার যেতাম। নমস্কার করলে ওঁর মধুমাখা হাসি দিয়ে হৃদয় ভরিয়ে দিতেন। ধন্য মনে হত নিজেকে, এরকম মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছি বলে।

২০০৯ থেকে ২০২০ এই দীর্ঘ সময়ে কারণে-অকারণে বহুবার শঙ্খবাবুর বাড়ি গিয়েছি। তাঁর ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি, কিন্তু তিনি আমার শিক্ষকই ছিলেন, জীবনের শিক্ষক। তাঁর আদব-কায়দায়, আলাপচারিতায় বহুকিছু শিখেছি আমি। সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা ও সহনশীলতা এসব ওঁর কাছ থেকেই শিখেছি। আমি বরাবর ফোন করে সময় চেয়ে ওঁর বাড়ি যেতাম। একদিন আমার দশ মিনিট দেরি হয়েছে পৌঁছতে—আমি বসার ঘরে বসেছি, কিছুক্ষণের মধ্যেই উনি ভিতর থেকে এলেন। পরিচিত হাসি। আমি নমস্কার করে নিজের জায়গায় বসলাম। আর কেউ ছিলেন না। আমি অপেক্ষা করছিলাম ওঁর প্রথম বাক্যটা শোনার। এল—অল্পক্ষণের মধ্যেই ধেয়ে নয় শ্লথ গতিতেই এল—সেই মৃদু স্বর, স্মিত হাসি ও একটি ছোট্ট ব্যাক্য, কিন্তু যেন তোলপাড় করেদিল আমার অন্তরজগত। বললেন, "তুমি দশ মিনিট দেরি করে এসেছ—তোমার সময় থেকে দশ মিনিট বাদ যাবে; ঠিক সাড়ে সাতটায় অন্য আর একজন আসবেন।" আমি অবাক, হতবাক যা যা হবার কথা সবই

বললাম। মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না এরকম একটা কিছুর জন্যে। অপরাধীর আর কি বলার থাকতে পারে। রায় মেনে নিলাম।

প্রয়োজনীয় কথাগুলো সেরে নিলাম—এবং ঠিক সাড়ে সাতটায় কলিং বেল বেজে উঠল—একজন পরিচারিকা বোধহয় দরজা খুলে দিলেন। আমি মাথা নিচু করে বসে আছি। হাসতে হাসতে একজন মাঝ বয়সি ভদ্রলোক বসার ঘরে প্রবেশ করলেন, নমস্কার সেরে, কাঁধের ব্যাগ, হাতের বইপত্র রেখে বসলেন। উনি নিশব্দ হাসি দিয়ে আগন্তুকে স্বাগত জানালেন।

এদিকে আমি চায়ের টেবিলে রাখা আমার তথ্যচিত্রের খসড়ার খাতাটা তুলে ব্যাগে রাখতে যাব, শুনলাম উনি আগন্তুককে বলছেন, "ও মুজিবর, রবীন্দ্রনাথের উপর তথ্যচিত্র করছে"। আগন্তুক খুব খুশি হলেন। আগন্তুকের পরিচয় দিলেন শঙ্খবাবু। উনি একজন প্রকাশক। ভদ্রলোককে আমি প্রথম দেখলাম কিন্তু ওঁর প্রকাশনা সংস্থা ও ওঁর নাম আমি অনেক শুনেছি। আমি আগন্তুকের জন্য বরাদ্দ সময় আর নষ্ট করতে চাইনি। আমি উঠলাম, সাথে সাথে উনিও উঠলেন। আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন যা তিনি সবার সাথে করেন। বিদায়ী নমস্কার সেরে আমি সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলাম। ঈশ্বরচন্দ্র নিবাসের প্রধান গেট পর্যন্ত আসা অব্দি শুধু ভাবলাম। কী ভাবলাম বোধহয় আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এরপর থেকে শুধু ওঁর ক্ষেত্রেই নয় সর্বত্রই আমার এই শিক্ষা কাজে লেগেছিল। এখন আমি আমার ছেলেকেও এ গল্প শোনাই।

শঙ্খবাবু রবীন্দ্রনাথের উপর আমার নির্মীয়মাণ তথ্যচিত্রের চিত্রনাট্য আটবার সংশোধন করে দিয়েছিলেন, বিভিন্ন খুঁটিনাটি

বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। ঠিক তিন বছরের মাথায় যখন ছবিটি শেষ হল, তখন আমার খুব ইচ্ছে হল স্যারকে একবার টালিগঞ্জের স্টুডিওতে নিয়ে যাওয়ার। আমরা তখন গলফ ক্লাব রোডে Film Service Studio-তে Sound design ও Mixing-এর কাজ করছি। ঐখানে ঠিকভাবে ছবিটি ওঁকে দেখাতে পারব বলে আমার মনে হল। কথাটা একদিন ওঁর সামনে রাখলাম সাহস করে। উনি আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। আমি বুঝলাম না কী তার মানে। আরও দুজন অতিথি ছিলেন সেদিন। একথা সেকথা হল। একসময় আমার ওঠার সময় হল। উনি নিয়মমাফিক দরজা পর্যন্ত এলেন। আমি বিদায়ী নমস্কার জানিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোব এমন সময় কানে এল ওঁর মৃদু স্বর। আমি চকিতে ঘুরে দাঁড়াতে, মৃদু হাসি, মৃদু স্বর ও ছোট্ট একটি বাক্য। প্রশ্নবোধক। "তোমাদের স্টুডিওতে কবে যেতে হবে বললে না তো?" প্রভাতের প্রথম রবিকিরণ যেন জলে এসে পড়ল। একরাশ আনন্দ নিয়ে আমি পার্কসার্কাসমুখী বাসে উঠলাম।

নির্ধারিত দিনে Film Service Studio-তে শঙ্খবাবু আমার ছিয়ানব্বই মিনিটের ফিল্মটা দেখলেন; দেখার পর উপস্থিত আমার সহকর্মীদের সাথে সামান্য সৌজন্য বিনিময় করে গাড়িতে এসে বসলেন। আমিও বিনা বাক্য ব্যয়ে ওঁকে অনুসরণ করলাম। গলফক্লাব থেকে হাডকো মোড় পর্যন্ত কারও মুখে কোনো রা নেই। গাড়ি থেকে নেমে নিজ এপার্টমেন্টর সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতে যাবেন, সামান্য ঘুরে দেখলেন আমি দাঁড়িয়ে আছি, "আর তোমাকে ওপরে আসতে হবে না"। ভিতরে ভিতরে আমি ভেঙে চুর চুর হয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু কোনোমতেই

তা প্রকাশ করছিলাম না। শুধু ভাবছিলাম ছিয়ানব্বই মিনিটের ছবিটা দেখে কি সত্যিই ওঁর কিছুই বলার নেই। তাহলে কি ছবিটা কিছুই হয়নি? আবার গোর্কিসদনের ঘটনাটা মনে পড়ছিল। হঠাৎই আমার অন্তর-ঝড় থেমে গেল। ভিতরের বিষণ্ণতা বাইরে প্রসন্নতা হয়ে প্রকাশ পেল—উনি জানতে চাইলেন, "আমরা যে ফিল্মটা দেখলাম তার কোনো ডিভিডি আছে তোমার কাছে?" আমি নিমেষেই বললাম, "হাঁ স্যার আছে"। তারপর ব্যাগ থেকে ডিভিডিটা বের করে দিলাম ওঁর হাতে। ওটা নিয়ে বললেন, "যাও আমি তোমাকে ফোন করব"। অন্ধকারের উৎস হতে যেন আলো উৎসারিত হতে দেখলাম। শুরু হল ওঁর ফোনের অপেক্ষা। এল— ঠিক সাত দিনের মাথায় ফোনটা এল। বললেন, "হাতে একটু সময় নিয়ে এসো"। সন্ধ্যায় গেলাম ওঁর ফ্ল্যাটে। সেদিনও ওঁর শোবার ঘরেই বসলাম আমরা। ডিভিডিটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, "এটা দেখা হয়ে গেছে। কতকগুলো কথা আমার বলার আছে।" এবার ঘূর্ণিঝড় শুরু হল আমার মধ্যে। উনি এক এক করে সাতাশটা পয়েন্ট উল্লেখ করলেন যেগুলো সংশোধন করার পরামর্শ দিলেন। সেগুলো বুঝে নিয়ে সবগুলো সংশোধন করার প্রতিশ্রুতি দিলাম। শুধু একটি বিষয় আমি সংশোধন করব না তা জানিয়ে দিলাম। উনি আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। বললেন, "যা সঠিক নয় তার উল্লেখ থাকা ঠিক নয়।" আমি এবার মরিয়া। হাতজোড় করে বললাম, "যদি আপনি আপনার নাম উপদেষ্টার জায়গা থেকে সরিয়ে নিতে বলেন তাহলে ছবিটা আমি কোনোদিন রিলিজই করব না"। খানিকটা চুপচাপ থেকে শুধু মৃদু হাসলেন। যেন হাজার ওয়াটের আলো জ্বলে উঠল।

Visuals		Voice over
ইতালিতে রবীন্দ্রনাথ । মুসোলিনি রবীন্দ্রনাথ। world map এ সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড highlight।। জাভা, ইন্দোনেশিয়া ।। বা জাভা ও ইন্দোনেশিয়ায় রবীন্দ্রনাথের ছবি ।।	৫৩)	১২মে ১৯২৬ । রবীন্দ্রনাথ রওনা হলেন ইতালির উদ্দেশ্যে । ৩১ মে ফাসিস্ত নেতা মুসোলিনির সাথে সাক্ষাৎ হল । ইতালির বিশেষ জায়গা ঘুরে দেখলেন রবীন্দ্রনাথ, চলতে থাকলো বক্তৃতা, সংবর্ধনা । ওখান থেকে রবীন্দ্রনাথ গেলেন সুইটজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি আরো কয়েকটা ইয়োরোপীয় দেশে । ১৯২৭ আবার বিদেশ যাত্রা, এবার জাভা আর ইন্দোনেশিয়ায় ।
ইংল্যাণ্ডে ছবি । হিবার্ট জার্নাল এডিটরের সাথে রবীন্দ্রনাথের ছবি ।। Religion of man বইয়ের প্রচ্ছদ।।	৫৪)	১৯৩০ সালের ২রা মার্চ রবীন্দ্রনাথ আবার বিলেতে গেলেন । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হিবার্ট বক্তৃতা হ'ল। সেই বক্তৃতা Religion of man পরবর্তী মানুষের ধর্ম নামে প্রকাশিত হয় ।
world map এ জার্মান highlight । রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের ছবি । মিউনিখে রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রদর্শনির কোন News coverage ।	৫৫)	ওখান থেকে তিনি গেলেন জার্মানিতে, সাক্ষাৎ হলো বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ও মানবতাবাদী আইনস্টাইন এর সঙ্গে । পৃথিবীর দুই মহান মানবতাবাদীর সেই সাক্ষাৎ আধুনিক কালের ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা । মিউনিখে কবির আঁকা বহু ছবির একটা প্রদর্শনী হল ।
রবীন্দ্রনাথের আঁকা কিছু ছবি ।। রবীন্দ্রনাথের কবিতা লেখার সময় আঁকিবুকি করে গঠিত চিত্র ।		কবিতা সংশোধনের সময় সেই কাটাকুটিকে ছবি করে তুলতেন তিনি । সৃষ্টি হত কতসব অতিকায় জীব, যা পৃথিবীতে পাওয়া যায় না । তারপর তার থেকেই ছবি আঁকার আগ্রহ তৈরি হল । বছর কয়েক ধরে সমানে একটার পর একটা ছবি আঁকা হল । সেসব ছবির চরিত্র অদ্ভুত । অন্যকোনও সৃষ্টির সঙ্গে সে চরিত্রের কোনও মিল নেই । যেমন সে সব ছবিতে রঙের ব্যবহার, তেমনি তার দৃশ্যপট অদ্ভুত, আবার তেমনি অজানা সব বিষয় ।
রাশিয়ায় রবীন্দ্রনাথ ।। News and Video footage ।।	৫৬)	১৯৩০ সালের ১১ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় যান । রাশিয়ায় কয়েক বছর আগে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক বিপ্লব হয়ে গেছে । সম্পূর্ণ একটা নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে সেখানে । এখানেও হল বক্তৃতা, চিত্র প্রদর্শনী ।
		৩১শে জানুয়ারী ১৯৩১ রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে এলেন। পাশ্চাত্যের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগের ইতি হল ।

চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবার মতো অভিজ্ঞতা। প্রায় দু-ঘণ্টা আমরা একান্তে কাটালাম। এইসময়ের মধ্যে কোনো কলিং বেল বাজেনি; মানে বুঝলাম সেদিন আর কাউকে উনি সময় দেননি।

এরপর প্রায় তিনমাস কেটে গেল। এল আমার জীবনের সেই প্রতীক্ষিত দিন—২০ ডিসেম্বর, ২০১১। নন্দন দুয়ে আমার তথ্যচিত্র, "রবীন্দ্রনাথ—জীবন ও সময়"-এর প্রথম প্রদর্শনী। ওঁকে আসতে অনুরোধ করেছিলাম। আসেননি—আমার সংশোধিত কপিটা আর একবার দেখে আমার কাঁধে হাত দিয়ে শুধু বলেছিলেন, "ভালো হবে"। এই শব্দ দুটো ছিল আশীর্বাণী ও আশার বাণী। কারণ ভালো যে হয়েছিল সেকথা বুঝেছিলাম সেদিন নন্দন প্রেক্ষাগৃহের নিস্তব্ধতা দেখে, দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধতা দেখে। ক্যালকাটা সিনে সেন্ট্রাল আয়োজিত সেদিনের উদ্বোধনী প্রদর্শনীতে আগত গুণীজনদের উচ্ছ্বাস, আবেগ ও প্রশংসায় আমি প্লাবিত হচ্ছিলাম। আমি শুধু স্পর্শ করছিলাম আমার কাঁধের ঐ জায়গাটা যেখানে শঙ্খবাবু ওঁর পবিত্র হাতটা রেখে বলেছিলেন, "ভালো হবে "।

বাংলা কবিতার মনোযোগী পাঠকেরা জানেন, সমসাময়িক দুই কবি শামসুর রাহমান ও শঙ্খ ঘোষ পরস্পরকে নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন। এ দুটি কবিতা—শামসুর রাহমানের 'ছড়ার আদলে' (*বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়*, ১৯৮৮) এবং শঙ্খ ঘোষের 'কবি' (*সমস্ত ক্ষতের মুখে পলি*, ২০০৭)। শেষোক্ত কবিতাটি রচিত হয়েছিল ঢাকা থেকে প্রকাশিত ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত সম্মাননা গ্রন্থ *নির্জনতা থেকে জনারণ্যে : শামসুর রাহমান* (২০০৬)-এর জন্য।

'শামসুর রাহমান' শিরোনামে শঙ্খ ঘোষের একটি অগ্রন্থিত কবিতাও আছে। যেটি ছাপা হয়েছিল ১৯৯৩ সালের ২২ অক্টোবর, বাংলাদেশের 'দৈনিক জনকণ্ঠ' পত্রিকায়, শামসুর রাহমানের পঁয়ষট্টিতম জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত শুক্রবারের সাময়িকীর বিশেষ ক্রোড়পত্রে।

'ছড়ার আদলে' কবিতায় শামসুর রাহমান লিখেছিলেন, "প্রশ্ন করি, যোগাযোগের সেতু ভেঙে গেলে, / একটি হাতের স্পর্শ তখন অন্য হাতে মেলে?" ক' বছর পরে শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'শামসুর রাহমান' কবিতায় লেখেন, "মাটিতে আগুনে শূন্যে ও জলে / ঢেউয়ে ঢেউয়ে সংঘাত—/ দেশ ভাবলেই মনে পড়ে তবু / সখ্যে বাড়ানো হাত।" আমাদের প্রিয় দুই কবির বন্ধুতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এ কবিতা দুটি এখানে সংকলিত হল।

রেজাউল করিম সুমন

দুই কবি

দুটি কবিতা

শামসুর রাহমান

শঙ্খ ঘোষ

গম্বুজ যায় মিনার মিলায়
মণ্ডপে নেই বাতি
ভুরুতে ভুরুতে কানাকানি করে
কী ধর্ম কোন্ জাতি
মাটিতে আগুনে শূন্যে ও জলে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে সংঘাত—
দেশ ভাবলেই মনে পড়ে তবু
সখ্যে বাড়ানো হাত।

পাড়ের উপরে কে আছো দাঁড়িয়ে
এমনই অসাবধানী
স্মিত হাসি আর সৌম্য চোখের
হাওয়ায় তোমাকে জানি
বুড়িগঙ্গার বাঁধাঘাট ছেড়ে
নৌকোরা বহমান—
বাংলাদেশের প্রতীক তো তবু
শামসুর রাহমান।

দুয়ার আদলে

শামসুর রাহমান

সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ গেলাম শঙ্খ ঘোষের বাসায়;
সমাজ আলতো পেখম মেলে সম্ভাষণের ভাষায়।
কবিকণ্ঠে গহনতা, চোখে পাতাল-ছায়া,
সত্তা জুড়ে উপার্জিত নান্দনিকের মায়া।

ড্রইংরুমের দেয়াল-জোড়া নানা শ্রেণীর বই;
মুগ্ধতাকে বশে রাখি, হারায় কথার খই।
হঠাৎ আবার কথা জোটে প্রাণ খুলে ফের হাসার,
বিশ্লেষণে তফাৎ ফোটে সোনা এবং কাঁসার।

স্নিগ্ধতাকে নাচিয়ে ঠোঁটে অল্প কিংবা বেশি
মনের ভেতর দুঃখ মুড়ে আমার প্রতিবেশী
অনিন্দ্য এক টিয়ে নিয়ে ফ্ল্যাটে করেন বাস।
তাঁর আকাশে ওড়ে কত ছন্দে-গড়া হাঁস।

মানবেতর জীবন কেন মানুষ করে যাপন?
সর্বশ্রেণীর সকল মানুষ হয় না কেন আপন—
এই ভাবনা ঘোরায় তাঁকে ভিন্ন পথের বাঁকে,
যখন তখন পদ্ম ফোটান বুক ডোবানো পাঁকে।

মেধা-মনন জুড়ে কবির রবিঠাকুর আছেন,
উপরন্তু বস্তুবোধের শিল্পসহ বাঁচেন।
প্রগতিকে মান্য করে ঋদ্ধ পথিক যিনি,
তাঁর প্রকৃতির বিশিষ্টতা হয়তো কিছু চিনি।

প্রশ্ন করি, যোগাযোগের সেতু ভেঙে গেলে,
একটি হাতের স্পর্শ তখন অন্য হাতে মেলে?
বিচ্ছিন্নতা এখন শুধু মনকে দখল করে,
আমির মধ্যে আমি বসে বিবাগী সুর ধরে।

বাগমারিতে জোনাক দেখি, এ কি আমার দোষ?
সঙ্গে ছিলেন রূপদর্শী, পদবী যাঁর ঘোষ।
শঙ্খ যখন বিদায় দিলেন একটি নমস্কারে,
সালাম বলে ট্যাক্সি ধরি ছিঁচ্‌কে অন্ধকারে!

বাঁ-দিক থেকে: অমিয় দেব, প্রতিমা ঘোষ ও শঙ্খ ঘোষ

বাঁ-দিক থেকে: আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, শঙ্খ ঘোষ ও নির্মলেন্দু গুণ

ছবি: দীপঙ্কর দাশ

শঙ্খ ঘোষ

স্পর্ধা

তার কোনো খ্যাতি নেই, তার জন্ম পরিচয় নেই
তার কোনো মুক্তি নেই লোকে যাকে মুক্তি ব'লে থাকে
যতদূর দেখা যায় সারি সারি কম্বল, পশম
আর কোনো ঢেউ নেই ঢেউয়ের সংঘর্ষে দ্যুতি নেই।
জীবন এত যে ভালো, সে-জীবনে অধিকার নেই
লজ্জাহীন সুন্দরের মুখে কোনো ম্লান আভা নেই
সারি সারি উট আর উটের চোখের নিচে জল
দু হাত বাড়িয়ে দেখে আর কোনো জলচিহ্ন নেই—
তবু সে এমনভাবে কোন্ স্পর্ধা ক'রে ব'লে যায়
'আমার দুঃখের কাছে তোমাদের নত হতে হবে!'

জান্নাতুল মাওয়া

কাছের মানুষ দূরের মানুষদের মৃত্যু-ভারের চাপে দিশেহারা। ভাবিনি আমার ছবি তোলার, ইন্টারভিউ নেবার বাকেট লিস্টের সবচেয়ে উপরে থাকা মানুষটিও এই যাত্রায় চলে যাবেন। গত ছয়মাস ধরে তাঁর অনেক বই জোগাড় করেছি, পড়াশোনাও শুরু করেছি। কবির সঙ্গে দেখা করব বলে। আশঙ্কা করছিলাম হয়তো বেশিদিন পৃথিবী তাঁকে পাবে না, কিন্তু তাই বলে এক্ষুনি!

মানুষ চিরকাল থাকেন না। শঙ্খ ঘোষ তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে, জীবনচর্চার মধ্য দিয়ে যে রাজনীতি-সংস্কৃতির বোধ রেখে গেছেন তার অর্ধেকও যদি মানুষ পড়েন, জানেন, কর্মে প্রয়োগ করেন, তা-ই বড়ো বিষয়। মুখ ঢেকে যাওয়া বিজ্ঞাপনের

শঙ্খ ঘোষ ও মিতা হকের সঙ্গে কবির নাতনি শাম্পান

ভিড়েও 'অন্ধের স্পর্শের মতো'ই তিনি এবং তাঁর কাজ থাকবে চিন্তা ও চেতনায়। এসব ভেবে ভেবে নিজেকে আবার ঠিকঠাক করি। ভেবেছিলাম বর্ডার খুললে ফ্রেমে বাধিয়ে তাঁদের দুজনার ছবি দিয়ে আসব প্রতিমাদিকে। ক্রিকেট জুটির মতো, এক হপ্তার ব্যবধানে প্রতিমাদিও চলে গেলেন।

২০০৮-এ ঢাকায় ফিরে আসি। তার কিছুদিন বাদে, অক্টোবর মাসে, টুনু মামার ফোন পেয়ে তাঁদের ধানমন্ডির বাসায় গিয়ে দেখি, শঙ্খ ঘোষ এবং তাঁর পরিবার। আমাকে বিস্মিত দেখতে চান, তাই আগে জানাননি। আমি একদমই অপ্রস্তুত, নির্বাক। বইয়ের মানুষ চোখের সামনে! প্রিয় পঙ্‌ক্তিমালার স্রষ্টা, শঙ্খ ঘোষ!

শঙ্খ ঘোষ ও রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী মিতা হক একান্ত আলাপচারিতায়

দেবাশিস বিশ্বাসের গান শুনছেন শঙ্খ ঘোষ

প্রতিমা ঘোষ, শঙ্খ ঘোষ এবং আ. ফ. ম. সাইফুদ্দৌলা (টুনু মামা)

কবি এবং কবিতা আরাধনার বিষয়। আমি শঙ্খ ঘোষকে চোখের সামনে দেখছি— এটা বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। নার্ভাস নামের যে একটা নার্ভ আমার আছে তা আগে কখনো টের পাইনি। মিতা হক, অদিতি মহসিন, দেবাশিস বিশ্বাস, আরও অনেকেই কবির সঙ্গে কথা বলছেন, গান করছেন। নাহাস ভাই, রূপা আপা, আমি কিছুই শুনছিলাম না, দেখ-ছিলাম না। আড়ালে-আবছায়ে শুধু কবিকে দেখি। স্বল্পভাষী কবি। সারস-রঙা পাঞ্জাবিতে আরাম কেদারায় বসে আছেন। পাশে রাখা ফুলদানিতে হলুদ কল্কে ফুল। কী দারুণ শান্ত অথচ দৃঢ়। সহজ মানুষ। দরাজ গলার স্বরের আকর্ষণে ঘোর জাগে।

শঙ্খ ঘোষ ও প্রতিমা ঘোষ

নাহাস খলিলের মা জুবেদা কে. রহমান ও প্রতিমা ঘোষ

দুই পরিবার— শঙ্খ ঘোষ ও প্রতিমা ঘোষ, তাঁদের ছোটো মেয়ে সেমন্তী ঘোষ এবং তিন নাতনি আমন (শ্রাবন্তী ভৌমিকের মেয়ে), শাম্পান ও মন্মন্-এর সঙ্গে কবি-পরিবারের আপনজন আ. ফ. ম. সাইফুদ্দৌলা, স্থপতি নাহাস খলিল ও জয়তুন সায়েফ (রূপা আপা)

শঙ্খ ঘোষ ও প্রতিমা ঘোষের সঙ্গে লেখক

গ্রুপ ছবি তোলার পর সবাই উঠে যাচ্ছিলেন। আমি প্রতিমাদিকে উঠতে দিলাম না। তাঁর মাধুর্যে চারপাশ রীতিমতো জ্বল-ছিল। পরিমিত বোধের দুজন মানুষ বৈঠক রুমের দূরত্বে। আরও কাছে বসার জন্য অনুরোধ করতেই নিবিড় হলেন। আমার আবদার আরেকটু বাড়তেই শঙ্খ ঘোষ প্রতিমাদিকে আলতো করে ধরলেন ঠিকই কিন্তু দুজনেই লজ্জার মাধুর্য নিয়ে হেসে উঠলেন।

ছবি: জান্নাতুল মাওয়া

নাহাস খলিলের ধানমন্ডির বাড়ির দেওয়ালে কবি শঙ্খ ঘোষের স্বহস্তে লেখা কবিতা

না হা স খ লি ল

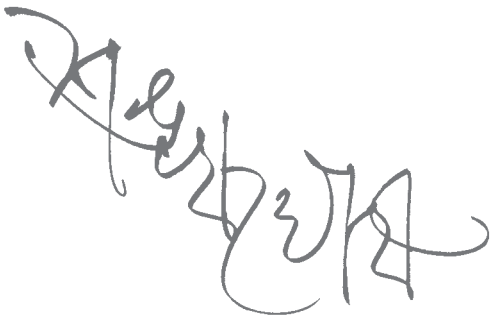

এ এক ঈর্ষণীয় অবস্থান আমাদের। রক্তের সম্পর্ক নয় কিন্তু পারিবারিক—আত্মার আত্মীয়। যে-কোনো মানুষের জন্যে এ রকমটা ভাগ্যের বটে। এই মানুষটা শঙ্খ ঘোষ।

আত্মার দাবিটা আমাদের নিজেদেরই। তবে আশা করি একপক্ষীয় নয়।

বড়ো মানুষের ঠিক মাপটা আত্মীয়ের কাছে পৌঁছুতে একটু সময় লেগে যায়। কাছে থেকে দেখবার নানা বেড়াজালে ঢাকা পড়ে যায় বড়ো মানসটা। অর্জন করে নিতে হয় সেই দৃষ্টি, বিন্দু বিন্দু করে দৈনন্দিনতার কঠিন দাবি ছাপিয়ে।

প্রায়শই বড়ো মাপটার সঙ্গে থাকে ব্যক্তিগত ছোটো ছোটো ব্যর্থতা। চল্লিশ বছরের এই আত্মীয়ের বেলায়, শ্রদ্ধার জায়গাটি একটি নিখুঁত ঊর্ধ্বগামী আবক্রপথ (trajectory)।

সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যেমন তাঁর নিশ্ছিদ্র কঠিন সাধুতা সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে থেকে গেছে তেমনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও একই কঠিন মানদণ্ডে স্থিত থেকেছে। এমনটি থাকবারই কথা হলেও, অন্য আরেকজনও যে চেনা নেই, সেটা নিশ্চিত।

স্বচ্ছদ্রষ্টা শঙ্খ ঘোষ। ঠিক পথটি বেছে নিতে পিছপা হন না। তাই সময়ে, পশ্চিমবঙ্গের সর্বজনস্বীকৃত বিবেকের ভূমিকা যে কখন আরোপিত হয়ে গেল তাঁর ওপর, তা নিরূপণ করা কঠিন। তবে এই ভার মানুষের নির্ভার অভিব্যক্তির অন্তরায় ঘটাতে পারে, সেটা অনুধাবন করা সহজ।

তাঁর বাড়ি সর্বসাধারণের কাছে এতটাই উন্মুক্ত যে তাঁর ব্যক্তিগত একান্ত পারিবারিক জায়গাটি অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে যেত। কারো অস্তিত্ব যখন দীর্ঘ সময় ধরে এ রকম সর্বসাধারণের জন্যে অবারিত, তার প্রভাব জীবনে অবধারিত, এটা ধরে নিয়েই পরের কথাগুলো বলছি।

বাংলাদেশে ফেরা তাঁর শৈশবে ফেরার মতো। সে সময় বিবেকের ভারটি থেকে, সাময়িক হলেও, তাঁর মুক্ত থাকবার ইচ্ছে লক্ষ করেছি। হয়তো এটা আমার মনগড়া বিশ্বাস, কিন্তু মনে হয়েছে, ঢাকাতে কম সময় কাটাতে পারাটাই তিনি চাইছেন, পাছে সাময়িকভাবে পরিত্যাগ করা দায়িত্ব এখানেও না পিছু নেয়।

লোকচক্ষুর আড়ালে একান্ত পারিবারিক জগতে দেখা মনে গেঁথে থাকা কয়েকটি মুহূর্তের কথা লিখতে ইচ্ছে হল।

ব্রহ্মপুত্রবক্ষে রাতে সপরিবারে কবি

নান্দিনা

নান্দিনায় আমাদের গ্রাম। ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে। বাংলাদেশের গ্রাম তাঁর পছন্দের জায়গা। পথে ময়মনসিংহের কিছু আগেই, রাস্তার ধারেই এক অপূর্ব জলরাশি, বর্ষার জলে টইটম্বুর।

থেমে উপভোগ করতে হবে। কাছেই চায়ের টংঘর। দাম মেটানোর পর্ব শঙ্খদার সঙ্গে এক ছোটোখাটো যুদ্ধ ছাড়া শেষ হওয়া অসম্ভব। সে যে-ই হোক-না কেন—মেয়ে, জামাই, ভাই, কারুরই ছাড় নেই। রীতিমতো মনখারাপ করা পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছুতে হয়। যুদ্ধে অবধারিত হারের আশঙ্কা নিয়েই আড়াল করে পকেট থেকে টাকা বার করতেই দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে হাত ধরে ফেললেন। বয়স্ক দোকানি ব্যাপারটি দেখে বললেন, "সারা জীবনই তো দিলেন, দেক না এখন, এরা বড়ো হইছে না?"

চেহারার প্রতিক্রিয়ায় এই কথার প্রতিফলন ভুলবার নয়! হাসিতে সব দৃঢ়তা গলে গেল। সবার পানে তাকিয়ে বললেন, "কী বললেন শুনলে?" জীবনযাপনের এক বড়ো সত্য যেন গ্রহণ করলেন ওই মুহূর্তে। জীবনের এ এক বিরাট প্রাপ্তি।

সকালের রৌদ্রে, নান্দিনা

উঠানে খড়ের আগুন, নান্দিনা

বাণারিপাড়া, বেনেবাড়ি নাচঘর

ব্রহ্মপুত্রে নৌভ্রমণ সন্ধ্যার ঠিক আগেই। বাণারিপাড়ার সন্ধ্যা নদীর স্মৃতি মনে করিয়ে দেবে অনুমান করছিলাম। সূর্যাস্ত হয়েছে, চাঁদও আকাশেই। দিনের আলো ফুরাবার আগেই চাঁদ আলো ছড়াতে আরম্ভ করেছে। মোটরচালিত নৌকা, উজানে চলছিল এতক্ষণ। ঘুরে ভাটাতে চলতেই মাঝিকে মোটর বন্ধ করতে ইশারা দিলাম। নিশ্চুপ প্রকৃতিতে কেবল আলতো শব্দ। মুহূর্তেই দেহ-ভঙ্গিমা বদলে গেল, সেই চাঁদের আলোতেও চেহারার উজ্জ্বলতা ভুলবার নয়। সম্ভবত ছোটোবেলার নৌভ্রমণের পরিমণ্ডলটা পূর্ণাঙ্গ হল।

বাণারিপাড়া

শৈশবের গ্রামে ফেরার পথে রকেটের ডেকে বসে কতই-না দমন করা আবেগ নিঃশব্দে পেরোচ্ছেন, পাশে বসে অনুমান করছি কেবল। রূপাকে শান্ত স্থির গলায় বললেন, "রকেটের স্মৃতি কেবল ছোটো লঞ্চ থেকে দেখা, সাহেবেরা ডেকে বসে"। ধরেই নেওয়া ছিল তখন যে, এ অভিজ্ঞতা তাঁদের ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাবে।

বাণারিপাড়ার পর্বটা সুন্দরভাবে ধরা আছে 'শঙ্খ' নামে এক প্রামাণ্যচিত্রে। তাঁর দেহের ভাষাই সেখানে বলে দেয় সব কথা।

চাঁদপুর

রকেটযোগে বাণারিপাড়া থেকে ঢাকা ফিরছি। সারা রাতের যাত্রা। গ্রীষ্ম হলেও, নদীপথের বাতাসে ডেকে হাড়কাঁপানো ঠান্ডা। অন্ধকারেও শরীর দিয়েই দেখবার যে কত কিছু রয়েছে,

নান্দিনায় পুকুরে, সাঁতার ভীষণ পছন্দের

ব্রহ্মপুত্র তীরে সূর্যাস্তের সময় কবি

তাই মোটা কম্বলে মুড়িয়ে ডেকচেয়ারেই বসে রইল গভীর রাত অবধি তিনটি কম্বলের স্তূপ!

বোধ করি রাত দেড়টা নাগাদ রকেট চাঁদপুরে ভিড়ল। জন্মের স্থান! মামাবাড়ির মধুর স্মৃতি অনেকবার শোনা।

কী রকম আবেগাপ্লুত মনের অবস্থা, যদিও মুখে কোনো ছাপ নেই ওঁর।

চুপচাপ নীচে গিয়ে জেনে নিলাম, ৩০ মিনিটের যাত্রাবিরতি। ডেকে ফিরে এসে মাথার একটু পেছনে, কানের পাশ থেকে জিজ্ঞেস করলাম, "নামবেন?" মাথাটা ঘুরিয়ে জ্বলজ্বল চোখে একেবারে শিশুর মতো প্রশ্ন, "নামা যাবে?"

"হ্যাঁ"—উত্তরের আগেই দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

এক রিকশায় রূপা আর শঙ্খদা, পেছনের রিকশায় আমি। ১৫ মিনিটে যাব আর ১৫ মিনিটে ফিরব। রাতে মেঘের ফাঁকে মৃদু চাঁদের আলোয় বাঁধের ওপর গ্রামের রাস্তা দিয়ে মামাবাড়ির স্মৃতি আওড়াতে আওড়াতে চলেছেন সামনের রিকশার ভদ্রলোক। দু-একটা শব্দ ছাড়া কিছুই শুনতে না পেলেও, আনন্দটা আজও পরিষ্কার দেখতে পাই।

চট্টগ্রামের পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে শীলা মোমেনের সঙ্গে, ১৯৮৬

কক্সবাজারের রামু-তে

সুন্দরবন

শরীর দিয়ে দেখেছেন সব, সারাজীবন। বাংলাদেশের দেখাটা যেন আরও তীব্র, আরও তীক্ষ্ণ বলেই মনে হয়েছে। সম্ভবত হারানো সময় পূরণের একটা তাড়না এবং পুনর্বার দেখতে পাবার অনিশ্চয়তা—দুটোই কাজ করেছে।

সুন্দরবনে হাঁটা হচ্ছে সকলে মিলে। ওয়াচ-টাওয়ারের ওপর থেকে বনের এক নতুন দৃষ্টিরূপ পাওয়া যাবে। সিঁড়ি বেয়ে অনেকটা ওপরে উঠতে হবে। পরিবারের কড়া নিষেধাজ্ঞা তাঁর ওপর। তাঁর বিদ্রোহী দৃষ্টি দেখে আমার ভাই ফাহাদ বলে উঠল, "এই না'র আদর আমার একেবারেই পছন্দ না"। ব্যস, অমনি "আমারও না" বলেই সিঁড়ি ভাঙতে আরম্ভ করলেন।

ঢাকা, পহেলা ফাল্গুন

নিজের বেশভূষার ব্যাপারে অটল, অনমনীয়। সাদা সুতির পাঞ্জাবি-ধুতি, কী শীত, কী গরম, একই চিরকাল। পহেলা ফাল্গুনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একা বেড়িয়ে বাড়ি ফিরলেন। পুরো পরিবার-সহ আমরা সবাই দেখে চমকে গেলাম।

কপালে বিশাল তিলক সাদা পোশাকের প্রতিতুলনায় জ্বলজ্বল করছে! তার থেকেও আশ্চর্যের বিষয় ওই আপাত-আত্মসচেতন মানুষটাই পুরো বড়ো কপাল রাঙানো তিলক বয়ে নিয়ে সারা শহর পেরিয়ে দিগ্‌বিজয়ী এক হাসি নিয়ে এসে দাঁড়ালেন।

বোঝা গেল ছাত্র-ছাত্রীরা বসন্তের শুভাগমন উদ্‌যাপনে আনন্দের সঙ্গে আবির দিয়ে দিচ্ছিল সকলকে। শঙ্খদাকেও

ব্রহ্মপুত্র নদে বৃষ্টির আশঙ্কা, নান্দিনা

ক্লোজ আপ, নান্দিনা

শীতের রাতে ঘুমের আগে আড্ডা, নান্দিনা

খালি গলায় গান খুবই পছন্দ করতেন কবি: অসীম দত্তের গান শুনছেন

এক ছাত্রী সাদরে কপালে আবিরের তিলক পরিয়ে দিয়েছিল। এইরকম স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ উদ্‌যাপনের প্রথায় তিনি মুগ্ধ, কপালের তিলকেও খুশি।

মানুষকে আসলে আমরা সকলেই একটু খণ্ডিতভাবেই চিনি। বড়ো মানুষদের—যাঁদের পদচারণভূমি অনেকটা ব্যাপৃত—তাঁদের ক্ষেত্রে তো এটা আরও বেশি সত্য।

হরপ্পার এই উদ্যোগ আশা করছি প্রিয় শঙ্খ ঘোষকে আমাদের জানা আরও খানিক সম্পূর্ণ করবে।

ছবি লেখকের সংগ্রহ থেকে

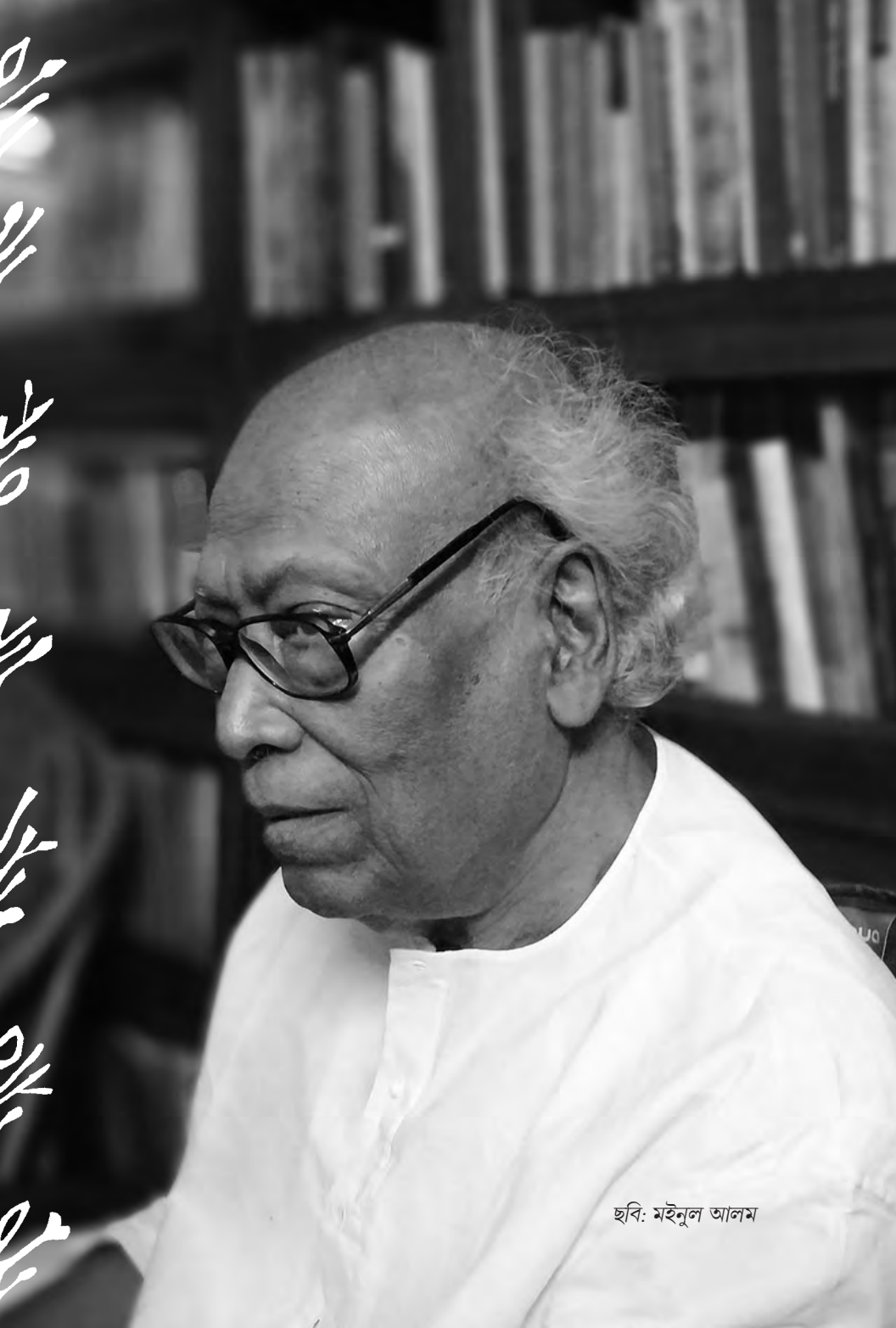

ছবি: মইনুল আলম

পিয়াস মজিদ

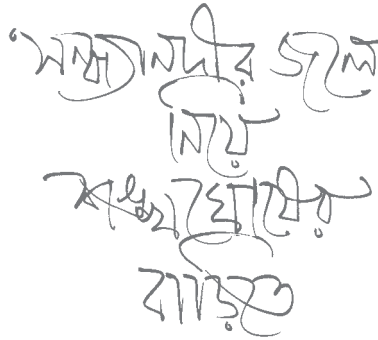

ফেব্রুয়ারি ২০১৯। তখন বইমেলা চলছে। এর কিছুদিন আগে প্রথমা প্রকাশন থেকে আমার সংকলন ও সম্পাদনায় বেরিয়েছে শামসুর রাহমানের *আমার ঢাকা* আর বেলাল চৌধুরীর *আমার কলকাতা*। সেই ফেব্রুয়ারিতে ওই বই দুটো সংকলন ও সম্পাদনার সূত্রে 'প্রথম আলো'র সম্পাদক মতিউর রহমান আমাকে দিলেন নতুন এক প্রস্তাব—কবি শঙ্খ ঘোষের বাংলাদেশ প্রসঙ্গের লেখাপত্র একত্র করে একটি সংকলন প্রস্তুত করতে হবে এবং সেটি প্রথমা প্রকাশন থেকে বের করবেন তিনি। 'শঙ্খ ঘোষ' নামটি বলাতেই আমার চোখে ভেসে এল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালে

আজিজ সুপার মার্কেটে এক ঘরোয়া সান্ধ্য আড্ডায় তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখার মাহেন্দ্রমুহূর্ত, সন্ধ্যার শান্ত উপহারের মতো যুগপৎ মিথ ও উজ্জীবক কথার ডালি মেলে ধরা তাঁর অবয়বটি। শঙ্খ ঘোষ মানেই তো সেসব দিন-রাত: 'রাত্রির কলস ভেঙে প্রভাত গড়ায় দিকে দিকে'।

আমি আবেগের বশে শঙ্খ ঘোষের বাংলাদেশবিষয়ক লেখার সংকলন সম্পাদনার প্রস্তাবে সম্মতিসূচক উত্তর তো দিলাম, তবে নাইতে নেমে বুঝলাম স্নান কতটা জলজটিল! বাংলাদেশ শঙ্খ ঘোষের লেখাপত্রে এমনভাবে ছড়িয়ে ও জড়িয়ে আছে যে তাঁকে আলাদা করে শনাক্ত করা কঠিন কর্ম বটে।

কবির গদ্যসংকলন তৈরিতে কবিতাই হয়ে উঠল পটভূমি ও প্রারম্ভিকা। কারণ, আমার স্মৃতিতে সজীব ছিল শামসুর রাহমানকে নিয়ে লেখা কবিতা 'কবি' এবং সৈয়দ শামসুল হকের প্রয়াণে আমাদেরই আহ্বানে লেখা 'কথা হবে' কবিতাটির কথা। শামসুর রাহমানের 'দুঃসময়ে মুখোমুখি' কবিতাটিকে অনেকেই ভুল করে 'দুঃসময়ের মুখোমুখি' লিখে থাকেন, এই গুরুতর প্রমাদ প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষের লেখাও পড়েছি আর ভেবেছি পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের কবি ও লেখকদের নামের বানান ভুলভাবে মুদ্রিত হওয়ার দুঃখজনক অভিজ্ঞতার বিপরীতে শঙ্খ ঘোষ এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম, যিনি যে-কোনো কবির কবিতার সম্পূর্ণ শুদ্ধ মুদ্রণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। ব্যতিক্রম তিনি আরও অনেক ক্ষেত্রেই, এই সংকলনের জন্য তাঁর খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত গদ্যসংগ্রহ আর সংগ্রহের বাইরের নতুন বইগুলো পড়তে বসে টের পাওয়া গেল। তাঁর গদ্য এতটাই স্থাপত্যসংহত এবং ললিতমধুর যে একটির

পাঠোত্তর অনুভবী মায়ামুগ্ধতা কাটিয়ে উঠতেই সময় লাগে ঢের; নতুন করে আবার অন্বেষণে পেতে হয় বেগ। বন্ধু আনোয়ার পাশাকে নিয়ে লেখা বিধুর গদ্য ছেড়ে মুহূর্তেই তাঁর ভ্রমণানন্দের গদ্যসমুদ্রের দিকে অনুসন্ধানী জাহাজ ভেড়ানো সম্ভব নয়।

তবু ধীরে ধীরে প্রবেশ করা গেল শঙ্খ ঘোষের বাংলাদেশ-বিভান্বিত সৃষ্টিসমস্তে। যতই গভীরে যাই, মধু। এই বাংলায় তাঁর নাড়ি পোঁতা; চাঁদপুর, বরিশালের বানারীপাড়া, পাবনার পাকশী—জন্মের দাগ লাগা মাটি, বেড়ে ওঠার ভিটে, শিক্ষার আলো পাওয়া জায়গা আর পরবর্তীকালের ভ্রমণের ভূমি। ফেলে আসা জায়গাজমির বস্তুগত টানের চেয়ে স্মৃতি দক্ষিণের বারান্দায় বসে থাকা প্রিয় সব মুখের রেখার মোহে এই বাংলায় ফিরে ফিরে আসেন তিনি। যখন সব পাখি ঘরে ফিরে যায়, তখন স্মৃতিপাখি মুহুর্মুহু ডানা ঝাঁপটায়। শঙ্খ ঘোষ নিখিল নিদ্রার নিনাদে, বিস্মরণের কুশলী কালে জীবনের স্মৃতিদীপ হাতে দাঁড়িয়ে থাকেন ঠায়। অক্ষরের অনন্ত আলোয় নিজের জন্য এবং আমাদের জন্য গদ্য লেখায় উপহার দেন তাঁর ব্যাপ্ত বাংলাদেশ পর্ব।

এভাবেই তো হৃৎকমলে ধুম লাগে, এভাবেই তো নিহিত পাতালছায়ায় দেখা হয় শীর্ষের শরীর। শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে এগোতে থাকি। খসড়া একটি পাণ্ডুলিপি দাঁড় করানো যায়, তবে বিষয় যেহেতু শঙ্খ ঘোষ, তাই তৃপ্ত হওয়া দায়। যেন-বা মধুর ভুলক্রমে প্রাথমিক খসড়াটি পৌঁছে গেল শঙ্খ ঘোষের হৃদয়খোলা দরবার-দরজায়। দিনকতক বাদে কাছের মানুষ কবি সন্দীপন চক্রবর্তীর হোয়াটসঅ্যাপ মারফত বার্তা আসে:

"উনি বললেন যে তোমার গোছানো দেখে উনি মুগ্ধ। এত ডিটেইলে তুমি ওনার লেখা পড়েছ... এমনকি অগ্রন্থিত লেখাও রেখেছ সংকলনে।"

এমন বার্তা আমার দ্বিধাগ্নিতে জল ঢালল মুহূর্তেই যে জল পাষাণ হয়ে নেই মোটেও। প্রাথমিকভাবে বইয়ের নাম নির্বাচিত হল 'বাংলাদেশ! বাংলাদেশ!!' সে অনুযায়ী প্রচ্ছদও হল। কলকাতায় গিয়ে কয়েক দফা শঙ্খদর্শনও হল। অসুস্থ শরীরে গোটা পাণ্ডুলিপি পড়ে চোখে পড়া প্রমাদ শনাক্ত করে দিলেন, লিখলেন অসামান্য এক 'আত্মপ্রসঙ্গ' আর আমার অনুধাবনে এল পীড়াগ্রস্ত হলেও মানুষ জরাগ্রস্ত নাও হতে পারে।

মুহিত হাসান আমাকে কিছু লেখার সন্ধান দিলেন, আরও বেশ অনেকটা দিলেন সন্দীপন চক্রবর্তী। সব মিলে বইয়ের আকার প্রাথমিক খসড়ারূপের প্রায় দ্বিগুণ দাঁড়াল। শঙ্খ ঘোষের বাংলাদেশবিষয়ক লেখার সংকলন হচ্ছে শুনেই তাঁর একটি-দুটি পরিচিত ভ্রমণগদ্যের কথা বলছিলেন কেউ কেউ, কিন্তু অনেকেরই অজ্ঞাতে ছিল বাংলাদেশকে প্রসঙ্গ করে, আত্ম-অনুষঙ্গে লেখা এত এত অনন্য গদ্য; যেখানে আছে আমাদের সামগ্রিক এগিয়ে যাওয়ার আশা আর একটিই কথা—ভালোবাসা, ভালোবাসা।

বাংলাদেশের প্রকৃতি, স্মৃতি আর এই বঙ্গের মানুষবিশেষকে নিয়ে তাঁর লেখা বেশ কিছু কবিতার খোঁজও পাওয়া গেল, তবে অনুভবের অতি সূক্ষ্ম স্তরে যে কবিতার খেলা চলে, সেখান পর্যন্ত তল্লাশি চালালে এই বইয়ে মুদ্রিত আত্মপ্রসঙ্গের মতোই বিষয়টি দাঁড়াবে।

"এমন কবিতা কমই লিখেছি যার মধ্যে—শব্দে বা প্রতিমায়—বাংলাদেশই প্রচ্ছন্ন হয়ে নেই।"

তাই কবিতাকে রাখা গেল তাঁর সৃষ্টিসামগ্র্যের অখণ্ড রূপেই। পাঠক সামগ্রিকতার মধ্য থেকেই বেছে নেবেন তাঁর কাঙ্ক্ষিত অংশকে। আমরা সংকলনটিকে সাজালাম পাঁচটি পর্বে—'একুশে, একাত্তর ও নববর্ষ', 'ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান', 'গানের ভিতর দিয়ে', 'শিক্ষা-আন্দোলন' ও 'স্মৃতি, ভ্রমণ'।

যখন বইয়ের কাজ অনেকটা অগ্রসরমাণ, সে সময় মতিউর রহমানই বললেন, 'বাংলাদেশ! বাংলাদেশ!!' নামটা ঠিক শঙ্খ ঘোষসুলভ হচ্ছে না, পরিবর্তন করা যায় কি না শিরোনামটা? ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে বার্তা পৌঁছানো গেল। আর কদিন পরই উত্তর এল। উত্তর তো নয়, যেন এই বইয়ের অবিকল্প শিরোনাম—'সন্ধ্যানদীর জলে: বাংলাদেশ'। 'সন্ধ্যানদীজল' নামের কবিতাও এসে সায় দেয় যেন এই শিরোনামে:

দুহাত তোমার স্রোতে, সাক্ষী থাকো,
সন্ধ্যানদীজল।
এমন তর্পণদিনে বহু মঠ পেরিয়ে পেরিয়ে
তোমার দুঃখের পাশে বসে আছি
এই ভোরবেলা।
আরও যারা এ মুহূর্তে নেই হয়ে
দাঁড়িয়ে রয়েছে,
আমার শরীর ঘিরে এমন সম্পূর্ণ যবনিকা
তাদের সবার শ্বাস দুহাতে অঞ্জলি দিয়ে আজ
এইখানে বসে ভাবি আমার সম্বল
স্থির থাকা।

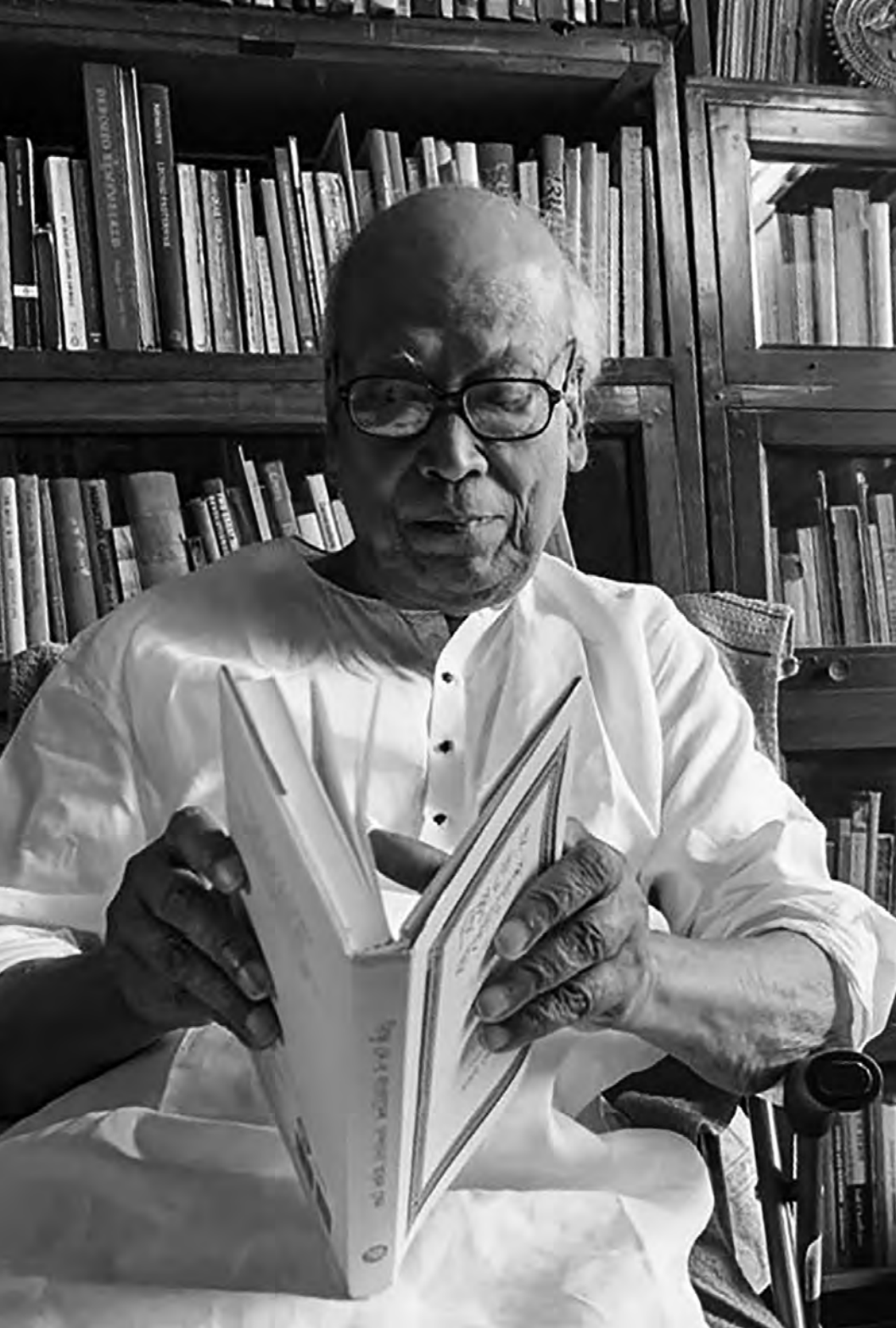

আমার সম্বল শুধু ঝুমকোঘেরা মঠ অবিকল
আমার নদীর নাম সন্ধ্যানদী,
তুমি তার জল।

শিল্পী মাসুক হেলাল আঁকলেন যথানুগ প্রচ্ছদ; যেন সন্ধ্যা নদীটাই তার স্মৃতিসজলতা নিয়ে দোল খাচ্ছে আমাদের আঁখির পাপড়িতে। বই প্রকাশিত হল। পাঠকের সাড়াও মিলল। দূরান্ত থেকে দু-একজন জানালেন, তাঁদের নিকটের নদী সন্ধ্যা যেন অবিকল উঠে এসেছে শঙ্খ ঘোষের গদ্যতরুর লতাগুল্মে।

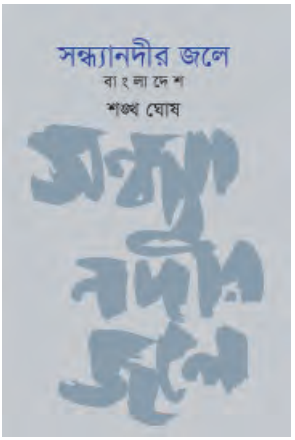

ভরসা পাই আর অপেক্ষায় থাকি, কবে তাঁর হাতে হাতে দিতে পারব বইটি।

সবকিছুর মতো একসময় অপেক্ষারও ফুরোয় প্রহর। ৯ নভেম্বর তারিখ ঠিক হয় তাঁর সঙ্গে দেখা করার, বই হাতে তুলে দেওয়ার। এর আগে ৭ নভেম্বর কালরাত্রির খবর হয়ে যান নবনীতা দেবসেন। আরও অনেকের মতো শঙ্খ ঘোষেরও তিনি হৃদয়-প্রতিবেশী। কলকাতার হিন্দুস্তান পার্কের নবনীতার ভালো-বাসা বাড়ির আঙিনায় দেখা হয় শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে; উপচে পড়া ভিড় আর শত শোকের মধ্যে আমার মনের মঞ্চে কে যেন আবৃত্তি করে চলে অনিবার্য শঙ্খ ঘোষ:

এইসব লেখা তার মানে খুঁজে পাবে বলে আসে
শহরের শেষ ধাপে কবরসারির পাশাপাশি

এপিটাফগুলি তার অভিধা বাড়ায় সন্ধ্যাবেলা
নগ্ন অক্ষরের গায়ে মৃত বন্ধুদের হিম শ্বাসে।

আছে মৃত্যু, আছে দুঃখ, তবু অনন্ত জাগে। আমরাও শোকের সায়র উজিয়ে জীবনজমিতে খুঁজে চলি প্রার্থিত পলি।

৯ নভেম্বর, গন্তব্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিবাস, যেখানে শঙ্খ ঘোষের আবাস। সঙ্গে প্রথমা প্রকাশনের হুমায়ুন কবীর, বন্ধু মাশফিক উল্লাহ, তন্ময় নামে যিনি বেশি পরিচিত আর সন্দীপন চক্রবর্তী। তন্ময় নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের স্টুডেন্ট ওয়েজ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত শহীদ বুদ্ধিজীবী আনোয়ার পাশার উপন্যাস *নীড় সন্ধানী* আর হুমায়ুন কবীর মতিউর রহমানের লেখা *আকাশভরা সূর্যতারা*। হুমায়ুন কবীরের হাত থেকে *আকাশভরা সূর্যতারা* বইটি হাতে নিয়ে লেখার সূচিপত্রে দৃষ্টি-পাত করে বললেন, "অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, পরিতোষ সেন; আমার সব প্রিয় মানুষের নিয়ে লেখা আর বাংলাদেশের বইয়ের কী সুন্দর নির্মাণ!" মুহূর্তে মনে এল তাঁর বইয়ের নামটি—*নির্মাণ আর সৃষ্টি*। আনোয়ার পাশা শঙ্খ ঘোষের বন্ধু, তাঁকে নিয়ে এই সংকলনে আছে *নদী নিঃশেষিত হলে* নামের এক অন্তরার্দ্র স্মৃতিলেখা, যেখানে তিনি বলছেন: "এখনো সজল আশা আছে তবে কোমল মাটি ও তৃণমূলে। এই মাটি ও তৃণের মধ্যে বেঁচে থাকবে আনোয়ার, আর তারই মতো আরও হাজার হাজার শহীদ।"

নীড় সন্ধানী হাতে নিয়ে শঙ্খ ঘোষ বারবার উলটেপালটে কী সন্ধান করছিলেন? হয়তো হারিয়ে যাওয়া বন্ধুরই স্মৃতির

ধূলিবালি। অস্ফুটে আমাদের বললেন, "আনোয়ার পাশার কবিতা পড়েছ তো?"

বললাম, "পড়েছি।"

"এই মাটিতে এখনো আছে বেঁচে থাকার মানে।"

এই কবিতার কথা কয়েকবার লিখেছেন শঙ্খ ঘোষ। লিখবেনই তো, কারণ তিনিও তো, আমরা সবাই তো কবিতা আর লেখার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার মানেই সন্ধান ও সম্প্রসারণ করে চলি।

সন্ধ্যানদীর জলে হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ মৌন বসে রইলেন শঙ্খ ঘোষ, যেন মৌনতার সুতোয় বোনা চাদরে একচিলতে হাসির উদ্ভাসে জানান দিলেন তাঁর অনুমোদন ও আনন্দ। আমরা মুহূর্তটি ক্যামেরায় বন্দি করতে চাইলে বাধা দিলেন। অবাক হলাম, কিন্তু পরক্ষণেই হলাম তার চেয়ে বেশি বিস্মিত। সন্দীপন জানালেন, তিনি নিজের বই হাতে কখনো ছবি তুলতে দেন না, তবে অন্য যে কারও বইয়ের ক্ষেত্রে সানন্দে ছবি তোলেন। যেমনটি এখানে মুদ্রিত আনোয়ার পাশার 'নীড় সন্ধানী' বই হাতে তাঁকে দেখা যাবে। এমনই তো শঙ্খ ঘোষ, 'আত্ম'-কে আড়াল করার ক্ষান্তিহীন সাধনায় যিনি অপরকে ভণিতাহীন 'আমি' ভাবতে পারেন।

হঠাৎ ইঙ্গিত করলেন, বাসার ভেতরের কক্ষে অসুস্থ প্রতিমা ঘোষকে একটি বই দিয়ে আসতে। আমরা গেলাম। প্রতিমা ঘোষ, নিজেও যিনি *নয় বোনের বাড়ি, সেইসব কথা, আপনজন ক'জন কবি*-এর মতো অসাধারণ কিছু বইয়ের লেখক। জীবনসঙ্গীর বই হাতে প্রতিমাদি এমন এক অপার্থিব হাসি উপহার দিলেন যে মুহূর্তটি প্রতিমাবদ্ধ হয়ে রইল আমাদের মানসবেদীতে।

একরাশ ভালো লাগার বোধ নিয়ে ফিরে এলাম শঙ্খ ঘোষ আর কলকাতার কাছ থেকে, বাংলাদেশের দিকে। কলকাতার কাছ থেকে বিদায় নেওয়া হলেও শঙ্খ ঘোষের কাছ থেকে কখনো হয় না বিদায় নেওয়া, কারণ সন্ধ্যানদীর জলের 'আত্মপ্রসঙ্গ'-তে তিনি তো বলেছেনই: "এ তো সত্যি যে মুহুর্মুহু আমি বেঁচে থাকি বাংলাদেশেরই মধ্যে।"

ছবি: দীপঙ্কর দাশ

শ্রী

২২৬এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলকাতা ৪ / ৪ নভেম্বর ১৯৭৪

শিশির,
বিজয়া-সম্ভাষণ জানিয়ে কদিন আগে তোমাদের চিঠি লিখেছি একটা, কিন্তু কাগজে যা দেখছি তাতে সে-চিঠি যে দিল্লী পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছে এমন কোনো ভরসা নেই। ওই পথে যাওয়াও নেই, সে ভরসা থাকতেও নেই! কাজেই ভাবছি হাতে-হাতে চিঠি পাঠাবার সুযোগটাই ভালো : মণীন্দ্রকে যখন পেয়ে গেলাম হঠাৎ।

তুমি যে মুশকিলে আছ, সে খবরটা তোমার না লিখলেও টের পেয়ে গেছি আমি। এবার দীপু-মণিদার কাছে [redacted] জানলাম যে তোমার শোনাতেও ছিল। এটা যে খুব ভালো হবে তা বলাই বাহুল্য, কিন্তু সেমিনারের পুরো অভিজ্ঞতাটা জানিয়ে চিঠি দিও এসে। সুবিধামতো কি এর কোনও খোঁজ পাব?

তোমাদের দুজনের শরীরই যে খারাপ চলছিল। এখন কি উন্নতি হয়েছে কিছু?

আমাদের দুজনের দিনগুলি বেশ দুর্ভাবনায় কাটল। তিনটি — আমাদের বড় মেয়ে — দিন কয়েক ছিল নিউমোনিয়ায়। আজ, একদিন পর, মনে হচ্ছে হয়তো সুস্থতার প্রান্তে পৌঁছল। মাথার থেকে ভুলো চুলগুলোই ওদের নিয়ে

ভূঁইয়া ইকবাল

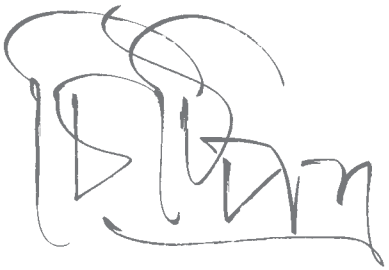

এখন আর আমাদের চিঠি পাবার দিন নেই। দিনের শেষে ডাকবাক্স খুলে দেখবার রোমাঞ্চ আর নেই। খবর দেওয়া-নেওয়ার দ্রুত-লভ্য আর তেমনই দ্রুত-বিলীয়মান অনেক পদ্ধতি নিত্যই এসে পৌঁছচ্ছে আমাদের হাতে, খবর আসে খবর মিলিয়ে যায়। চিঠি তো শুধু খবর নয়। পুরোনো চিঠির ঝাঁপি যদি খোলা যায় হঠাৎ, তাহলে কত-না কালস্মৃতি ভেসে আসে তার চরিতার্থতা অচরিতার্থতা নিয়ে, তার সুখবোধ বা বেদনাবোধ নিয়ে।

শ্রী

১০৩ই কর্নওয়ালিস স্ট্রিট
কলকাতা - ৪
৭ জানুয়ারি, ১৯৬৬

প্রিয়বরেষু,

সময়মতো চিঠির উত্তর না পেয়ে বিরক্ত হয়ে থাক
[illegible] বিজয়ার শেষে হঠাৎ আমার ইতিমধ্যে একটা
পারিবারিক ঘটে গেছে, [illegible] করে [illegible] [illegible]
এসেছি। এ-দুর্ঘটনার ফলে [illegible] এমন হাল হয়
হয়েছে দিন কেটেছে যে [illegible] কিছুই করে উঠতে পারছি
[illegible] [illegible] [illegible] বলা যায় না।

[illegible] [illegible] [illegible] হয়ে গেছে [illegible]
[illegible] না [illegible], [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible]!

নিউইয়ারের শুভ দিনে তুমি সকলের [illegible],
ও [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] তোমার [illegible] [illegible]
[illegible]। চিরশুভেচ্ছান্তে

শ্রী [illegible]

শঙ্খ ঘোষ তাঁকে লেখা একগুচ্ছ চিঠি গ্রথিত করেছেন তার *পুরোনো চিঠির ঝাঁপি* সংকলনে। উল্লিখিত অনুচ্ছেদটি ওই বইয়ের 'সূচনাকথা'র সূচনা। আধুনিক প্রযুক্তির কারণে হাতে-লেখা চিঠি বর্তমানে আরকাইভ-সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। ফলে ব্যক্তিত্বের স্পর্শ-লাগা হস্তাক্ষরের চিঠিপত্র এখন মহার্ঘ্য। চিঠির—বিশেষ করে শিল্পী সাহিত্যিকদের হারিয়ে যাওয়া চিঠি উদ্ধার এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

এই বইয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী শঙ্খ ঘোষের কয়েকটি চিঠি সংগ্রথিত। চিঠিগুলো ১৯৬৬ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে কলকাতা ও শান্তিনিকেতন থেকে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক আরেক মনীষী সাহিত্যিক শিশিরকুমার দাশকে লেখা। সমকালীন বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে শঙ্খ ঘোষের পরিচয় এখন সুবিদিত। পত্রপ্রাপক কলকাতায় জন্মগ্রহণ এবং শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করলেও কর্মসূত্রে বেশিরভাগ সময়ে লন্ডনে (১৯৬০-৬৩) ও দিল্লিতে (১৯৬৩-২০০৩) প্রবাসী থাকায় কলকাতায় এবং বাংলাদেশে প্রায় অপরিচিতই রয়ে গেছেন। তিনি ছিলেন নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, সাহিত্য-সমালোচক, কবি, ভাষাবিজ্ঞানী, শিশুসাহিত্যিক, অনুবাদক এবং সম্পাদক। তিনি অন্তত চৌত্রিশটি নাটক বা নাটিকা লিখেছেন, বারোটি প্রবন্ধগ্রন্থ রচয়িতা। তাঁর কীর্তিস্তম্ভ তিন খণ্ড *ইংলিশ রাইটিংস অব রবীন্দ্রনাথ টেগোর* সম্পাদনা এবং *হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ান লিটারেচার*-এর শেষ দুই খণ্ড রচনা। তিনি মূল গ্রিক থেকে অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব, সফোক্লেসের *রাজা অয়দিপৌস* এবং *আন্তিগোনে* ইত্যাদি তরজমা করেছেন।

ওঁ

২৯ মার্চ ১৯৭৪

নির্মলাদি

সুরেশ্বর মৈত্র দিয়ে গেল কোনো লেখা কাগজটা দিন। আমার মেয়ের বৌ, শার্লি কলকাতায় পাঠিয়েছি — মনে হচ্ছে ঠিক সমুদ্রপারে নিয়ে এলাম আমার। যে-রকম আবহাওয়ার ভিতর ছিলাম দিল্লীতে, যে যেন ধারেকাছে মুক্তি করে পাওয়া, সে এখন আমার প্রাণ ছিল না একেবারেই। মাঝে মাঝে মানুষের জীবনে এমন ঘটে যায়। একেবারে যখন অনেকের দুঃখ পাচ্ছ কখনো, মনে রাখতে ভুলো না যে অনেকের সুখও জীবনে পেয়েছি অনেকবার, নিজেকে করে তাই সহজে না। দিল্লীর দিনগুলি একটা দুঃস্বপ্ন হয়ে রইল আমার স্মৃতিতে।

তোমার মতো একজন কেউ বাইরে প্রবাসে পাশে থেকে দিনের পর দিন, এ যে কতখানি শান্তি দিয়েছে, তা তোমাকে কখনো কখনো মনে হয়েছে। কিন্তু এত বেশি করে যে বুঝতে পারিনি কি বলব। কলকাতায় ফিরে দিল্লীর যেমন দিনগুলো দূর থেকে দেখি এখন, তোমার সেবাকে তা মনে পড়বে। আমার সেই সেবাকে কিন্তু আমার মধ্যে দিয়েই এত উপেক্ষিত হয়ে তুমি থাকবে শুধু — কী এতদিন সে থাকবে।

কলকাতার গরমেই এই দুপুরেই আমার শেষ চিঠি

শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২-২০২১) ও শিশিরকুমার দাশের (১৯৩৬-২০০৩) সম্পর্ক ছিল অগ্রজঅনুজপ্রতিম। এই দুই মনীষী সাহিত্যশিল্পীর মধ্যে যে পত্রব্যবহার হয়েছিল তার কয়েকটি আমাদের হস্তগত হয়েছে। শিশির দাশের কিছু পত্র শঙ্খ ঘোষ উপযুক্ত ভাষ্যসমেত সংকলন করেছেন *পুরোনো চিঠির ঝাঁপি* (২০১৯) গ্রন্থে।

পত্রকার ও প্রাপক—শঙ্খ ও শিশির দুজনেই গত শতকের পঞ্চাশের দশকে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজের ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী। শঙ্খ ১৯৫১ সালে বিএ ও ১৯৫৪ সালে এমএ পাশ করেন আর শিশির ১৯৫৫ সালের অনার্স ও ১৯৫৭ সালের এমএ।

শিশির ছিলেন শঙ্খর ভাই নিত্যপ্রিয় ঘোষের বন্ধু। শঙ্খ ঘোষের পিতা মণীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৮৯৮-১৯৮৯) শিশিরকে লিখেছিলেন:

> ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত একদিন বলছিলেন তিনি যত ছাত্র পড়িয়েছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী শিশির। ... তোমার সম্পর্কে আমার পুত্র শঙ্খর খুব উচ্চ ধারণা।
>
> (দেখুন, মণীন্দ্রকুমার ঘোষ, *শিশির-সুবীরের সঙ্গে ভাষালাপ*, কলকাতা: প্যাপিরাস। ২০১৮, পৃ ১৩)।

শঙ্খ-শিশিরের পারস্পরিক স্নেহ-শ্রদ্ধার পরিচয় আছে তাঁদের বই উৎসর্গের মধ্যে। শঙ্খ তাঁর *ছন্দোময় জীবন* (১৯৯৩) উৎসর্গ করেছেন শিশির ও তার স্ত্রী সুস্মিতা দাশকে। আর শিশির তাঁর তরজমা-নাটক *বন্দিনী* (১৯৮৩) [পরিবর্ধিত সংস্করণের নাম *ট্রয়কন্যা*, ২০০১] উৎসর্গ করেছিলেন শঙ্খ ঘোষকে। শঙ্খ ঘোষের *ঐতিহ্যের বিস্তার* (১৯৮৯) প্রবন্ধ সম্ভারের রসগ্রাহী

ঐ

২২৬এ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলকাতা ৪ । ২৭ জুন ১৯৭৪

দিদিমণি,

তোমরা কি কলকাতায় ফিরে ভুলেই গেলে লোকটিকে? অবশ্য, এখন একটা ঘূর্ণির মত অবস্থায় চলছে কলকাতায় যে কিছু না করেও মনে হয় কত কাজ করছি। দিল্লীর দিনগুলির সঙ্গে তুলনা করে দেখলে এখানে আমার প্রতিদিনের দিনযাপন অনেক বেশি ভার ক্লান্তিকর, কিন্তু মনে হয় যে স্রোতের টানেই চলছি, দিল্লীর অভিজ্ঞতাগুলোর একেবারে কিছু লেখা শুরু হলো ওই এখানে।

যতীন কি এখনো দিল্লীতে, না চলে গেছে শিলংয়ে? ভাবছি যে তোমার কাছে লিখব যে এর মধ্যে কলকাতায় ওকে দেখতে পাব একবার। না কি তার হয়ে উঠবে না? 'প্রবাসী' পত্রিকার জন্য যে-লেখাটি ও চেয়ে রেখেছিলেন সেটি দিয়ে এই ভাবছি যে পত্রিকাটি শুরু হবে মাসের মধ্যে এখন। তবে বুঝতে পারছি না, কোন সংখ্যায় বেরোবে কি জানি, এবং সম্ভবত সেই সংখ্যার [illegible] একেবারেই তার দেখার কথা ইচ্ছা আছে। যতীন যদি এখানে ওখানে যাওয়ার আগে একবার দেখা করে যেতে, তবে কোন পত্রিকায় — [illegible] 'কবিতা'
[illegible] ও [illegible] না! [illegible]।

শ্রীমতী [illegible] অনেক ভালবাসা জানিও [illegible]

ও গভীর আলোচনা করেছেন (অনুষ্টুপ, শঙ্খ ঘোষ বিশেষ সংখ্যা, ১৯৯৪)। *ঐতিহ্যের বিস্তার* 'এক সংবেদনশীল কবির আত্মজিজ্ঞাসা' বলে মন্তব্য করেছেন শিশির দাশ। তাঁর মৃত্যুতে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় শোক-নিবন্ধ লিখেছেন শঙ্খ ঘোষ। অনুজ শিশির সম্পর্কে শঙ্খর মন্তব্য:

> শিশিরের কথা উঠলে কলম যেন আর থামতেই চায় না। এমন একজন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যময় মানুষ, সব সময়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখা এমন একজন ভাবুক আর লেখক—সে যে সেই একসঙ্গে নিজের চারপাশটাকে মাতিয়ে রাখতে পারে কী স্বতঃস্ফূর্ত কৌতুকে-রঙ্গে—এ অভিজ্ঞতাটা প্রায় অবিশ্বাস্য লাগত আমার।
>
> ('সংযোগের মানুষ', 'চতুরঙ্গ', বর্ষ ৬২ সংখ্যা ৩-৪)।

শঙ্খ ঘোষের অনুরোধে প্রকাশনা-সংস্থা প্যাপিরাসের কিশোর জীবনী সিরিজের জন্যে শিশির দাশ লিখেছিলেন *মাইকেল* (১৯৯৪)। লেখার জন্য সময় দেওয়া হয় মাত্র মাসখানেক। যথাসময়ের আগেই পাণ্ডুলিপি পৌঁছে যায় শঙ্খর কাছে। তবে তারও আগে পৌছেছিল এই 'রগড়-করা পদ্যলিপি' [মধুসূদনের চতুর্দশপদীর অনুসরণে]:

> মহামতি শঙ্খ ঘোষ
> বিদ্যাসাগর নিবাসস্থ কবিশীর্ষেষু
>
> আপনি ভাবেন নিত্য, দিল্লীবাসী, দাস
> ঘুমায়ে কাটায় কাল, (কচ্ছপ যেমতি
> আহা, চিড়িয়াখানায়) সদা খাই-খাই
> মধ্যম পাণ্ডব যথা। হায় ভ্রাতঃ, আমি
> মন্দমতি, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে।
> প্রতিজ্ঞা করিনু আজি, আলস্য ত্যাজিয়া

শ্রী

২২৮এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলকাতা ৪ । ৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪

প্রিয়বরেষু

অনুবাদের টুকরোগুলি যে হাতে এসে পৌঁছেছে, অনেক আগেই সে-খবর জানানো উচিত ছিল। জানাতে যে পারিনি তা ওর অনিচ্ছার কারণে নয়, কিন্তু অনিচ্ছার চেয়ে উদাসীনতাও। এই পুজোর সময় থেকে কিছু যে ভুগছি তার জের এখনও নেই, মাঝে মাঝে দু'একদিন মনে হয়েছিল হয়ত যে সেরে উঠল, কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে অসুখটা চলবে কিছুদিন। ইতিমধ্যে ও: তৈরি পরীক্ষাটা দেওয়া শেষ হয়েছে, শেষ পরীক্ষাতে কী উতরোতে বুঝতে পারছি না। সেই অবস্থা চলছিল; সময় এসেছে এখনও।

তোমার অনুবাদ, যেমন আমার আশা ছিল, খুব ভালো। অনুবাদ আর দীপক এখন যদি শেষ করে থাকে, এবার এ নিয়ে কিছু আলোচনা কি করবে? তা হলে আমার ব্যাপারটায় অনেকখানি হতে পারে।

দ্বিতীয় খাতার উত্তরে উত্তর দিচ্ছে যে প্রশ্ন তুলেছ তার উত্তর দেওয়া খুব শক্ত। অন্য অনেক সময় 'ভারতকোষ'-এর মতো কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকবার সময়ে এ নিয়ে আমার বেশ কিছু ভাবনা-চিন্তা। ইংরেজি উচ্চারণ নয়, বাংলাভাষার মূলসূত্রেই করা উচিত এমনও : এইরকম ভেবেছিলাম একবার। কারো অনেক কথাকে কথাকে বলেছি, সাধারণ পাঠকের পরিচিত শব্দগুলোকে এমন অনেক চেহারায় সাজানো দেখাবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু তবু, শেষ পর্যন্ত,

পালিব তোমার আজ্ঞা, শার্দূল (য.) যেমতি
হঠাৎ পাইলে ক্ষুধা ছুটে মৃগপানে
P.T. Usha-সম গতি।
দাও, তিনদিন।
(শারদীয় পূজা যথা) তিনটি রজনী
লিখিব এমন গ্রন্থ গৌড়জন যাহে
কান্দিবে ফুকারি উঠি প্রবল আতঙ্কে
স্বপনে শিশুরা যথা শুনি শঙ্খ-ঘোষ।

শিশিরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বিষয়ে শঙ্খ ঘোষ চারণ করেছেন স্মৃতি:

> যখন বি.এ. পড়ছে শিশির—শিশিরকুমার দাশ—পঞ্চাশের দশকের সেই মধ্যভাগ থেকেই তাকে জানি, কেননা প্রেসিডেন্সি কলেজে সে তখন আমার ভাই নিত্যপ্রিয়র অন্তরঙ্গ সহপাঠী।... ... শিশিরের সঙ্গে সত্যিকারের যোগ- বন্ধুত্বের যোগ তৈরি হলো... ১৯৭৪-এ আমার সেই দিল্লিজীবন থেকে।
>
> ... সুস্মিতা আর শিশিরের স্নিগ্ধ আবাসে নিরন্তর আতিথ্য, আর তারই সঙ্গে বাংলা বিভাগের ছাত্র-অধ্যাপকদের সঙ্গে আনন্দ মেলামেশার সঙ্গে সঙ্গে সেমিনারে সেমিনারে শিশিরের পাণ্ডিত্য মুহূর্তগুলিকে প্রত্যক্ষ করা— এসবের মধ্য দিয়ে দু'মাস কাটিয়ে যখন ফিরে এলাম কলকাতায়, বুদ্ধদেব বসুর মৃত্যু সংবাদ জানবার পরে বেশ ফাঁকা-ফাকাই লাগছিল তখন।
>
> (দেখুন, *পুরোনো চিঠির ঝাঁপি*, পৃ ৫৬-৫৭)।

দিল্লির প্রবাসী বাঙালিদের পত্রিকা সম্মিলনীর জন্য কবিতা প্রার্থনা করে লেখা শিশিরকুমার দাশের ১৫ জানুয়ারি ১৯৬৬ তারিখের চিঠির জবাব এই সংগ্রহে শঙ্খ ঘোষের প্রথম চিঠি।

শ্রী

১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪

নির্মল

তোমার চিঠি, আমার চিঠির জবাবের সোজা হয়ে থাকবে তোমারও। এখন দেখছি দুজনের-লেখা বিষয়ে অনেক সম্পর্ক মিলেছে : দুজনের তোমার লেখাই হয়ে গেছে। এত ভাবনার কোন কারণ থাকল না?

metre-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'বৃত্ত' আমার পছন্দ হচ্ছে না জেনো। যে অন্যান্য কারণ ছাড়াও একটা বড় কারণ এই যে সাধারণের একটু বিভ্রান্ত লাগবে কাছে ওই শব্দ। ওর চেয়ে বরং, একটু অসুবিধাজনক হলেও, ছন্দরীতি চলতে পারে।

কিন্তু ছন্দরীতি পর্যন্ত যেতে হচ্ছে যে 'ছন্দ' শব্দটিকে এড়িয়ে যাবার জন্যই? metre অর্থেই 'ছন্দ' ব্যবহার তো অনেকদিন ধরেই চলছে। অসুবিধে বিভ্রান্তই হচ্ছে rhythm-এর প্রতিশব্দ নিয়ে, এই তো? রিদ্‌ম্‌-এর জন্য একটা শব্দ পেলে হয়তো 'ছন্দ'কে ছেড়েই রাখতে পারতাম metre-এর জন্য। যদিও, সবাই জানেন যে 'ছন্দ' শব্দটি metre-এর চেয়ে অনেক ব্যাপক।

সংস্কৃত ঐ ছন্দঃশব্দ (বিশেষণটির প্রতি অবিচার করতে চাই) অনেক জায়গায় প্রযুক্ত হয়েছে রিদ্‌ম্‌ অর্থে। সেইটিকে চালিয়ে দিলে ক্ষতি কী?

এটা বিতর্কের বটেই, কিন্তু এ নিয়ে আমার কোনো অভিমান নেই। তোমার যেমন পছন্দ, সেইরকমই দিয়ো।

২২ জুলাই ১৯৭৪এ শঙ্খ অ্যারিস্টটলের *পোয়েটিকস*-এর বাংলা অনুবাদের ভার নিতে শিশিরকে অনুরোধ করে যে-চিঠি লেখেন, ৫ আগস্ট ১৯৭৪, সেই চিঠির সরস জবাব শিশিরের :

> পোয়েটিস্-এর বাংলা অনুবাদ হওয়া তো উচিত। কিন্তু...। আপনার শর্ত তিনটি, গ্রীক জানা, সাহিত্যবোধ থাকা আর বাংলা জানা। আমি গ্রীক জানি বললে সক্রেটিস আর্তনাদ করে উঠতে পারেন। সাহিত্যবোধ? আমার ধারণা ছিল যে আমার সাহিত্যবোধ ছিল। ইদানিং সকলের সন্দেহের ফলে, আমারও সন্দেহ হয়। বাংলা সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই না, কারণ বাংলা জানি এই অজুহাতে বাংলাদেশের বাইরে করে খাচ্ছি— যদিও আমাদের ভাইস-চ্যান্সেলার সেদিন তাতেও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, উনি বলেছেন বাংলা পড়াতে যাকে দিল্লী আসতে হয়, সে নিশ্চয়ই বাংলাদেশের অতি নিকৃষ্ট মাল, নিজের দেশে rejected হয়ে অবাংলা অঞ্চলে চাকরি খুঁজতে বেরিয়েছে।...

পোয়েটিক্স-এর তরজমা প্রসঙ্গে শঙ্খ জানাচ্ছেন:

> ওকে আমি উসকে দিচ্ছিলাম 'পোয়েটিক্স-এর একখানা বাংলা অনুবাদের জন্য। এ-কাজে তার চেয়ে আর যোগ্য কে হতে পারে, বিশেষত গ্রিক ভাষাটা এমনভাবে যার জানা। কিছু দ্বিধার পর সে-প্রস্তাবে রাজি হয়েছিল শিশির, আর তৈরিও হয়ে গেল সে অনুবাদ।

(*পুরোনো চিঠির ঝাঁপি*, ২০১৯, পৃ. ৫৭-৬১)

উল্লিখিত চিঠিতেই শিশিরকুমার জানাচ্ছেন যে, ইতোমধ্যেই [একদা] প্রথম এগারোটি পরিচ্ছেদের তরজমা করে ফেলেছিলেন এবং মূল শব্দের অর্থ, বিভিন্ন পণ্ডিতদের ভাষ্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে পাদটীকা তৈরি করেছেন।

পঞ্চম পত্রে শঙ্খ ঘোষের প্রশ্নের ("তোমার অ্যারিস্টটল কতদূর?") উত্তরে ১৯ নভেম্বর ১৯৭৪এর চিঠিতে শিশির জানালেন:

Poetics এর অনুবাদ শেষ করেছি। অবশ্য অনেক ঘষতে মাজতে হবে।... অনুবাদের সমস্যা অসংখ্য। শব্দ পাই না। Metre আর rhythm দুটোতো আলাদা ব্যাপার কিন্তু বাংলাতে তো দুটো শব্দ নেই। ছন্দ মানেই তো rhythm, কিন্তু Metre কি? মাপা-ছন্দ, মিত্র ছন্দ, ছন্দ মিতি? একটা শব্দ দিন না। অ্যারিস্টটলের যে শব্দটির ইংরেজি 'discovery/recognition' তার বাংলা কি করব? অ্যারিস্টটল ব্যাখ্যায় বলেছেন অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানে উপনীত হওয়া,— একে কি আবিষ্কার বলা চলে?

এই চিঠিতে শিশির তাঁর পূর্বসূরী সাধনকুমার ভট্টাচার্যের স্বেচ্ছাচারী শোচনীয় অনুবাদের উল্লেখ করে রসিকতা করেছেন:

সাধন বাবুর সঙ্গে এতদিনে নিশ্চয়ই অ্যারিস্টটলের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তবে হয়তো বুচার বা বাইওয়াটার এমন ধমক দিয়েছেন যে অ্যারিস্টটলের সঙ্গে দেখা না করে সোজা শশিভূষণ বাবু কিংবা সুনীতিবাবুর কাছে সান্ত্বনা খুঁজতে চলে গেছেন।...

এই চিঠিতে শঙ্খর মতামত প্রার্থনা করে শিশির জানতে চেয়েছিলেন:

...গ্রীক শব্দের উচ্চারণ থাকবে না প্রচলিত উচ্চারণ রাখব? 'ইডিপাস' বললে যখন সবাই বোঝে তখন 'অএদিপুস' লিখব কিনা? কিংবা অ্যারিস্টটল বা ইস্কিলাস-এর বদলে আরিস্তোলেস বা এইস্ খুলুস?

শঙ্খর জবাব:

সাধারণ পাঠকের পরিচিত নামগুলোকে এমন অচেনা চেহারায় সাজালে যোগাযোগের কোন বিঘ্ন ঘটবে না তো? কিন্তু তবু, শেষ পর্যন্ত আমি 'আরিস্তোতেলেস'-এরই পক্ষপাতী।

অষ্টম চিঠির জবাবে সঙ্গে সঙ্গেই ২১ অক্টোবর ১৯৭৫ জবাব আসে :

Poetics এর অনুবাদ, ভূমিকা এবং আনুষঙ্গিক মন্তব্য সব তৈরী। একটা Copyও তৈরী করেছিলাম। কিন্তু আবার তাতে কাটাকুটি

করে ফেলেছি। অবশ্য আর একটা 'কপি' করা দুঃসাধ্য নয়। আমি যে পাঠাইনি তার কারণ হল, আমি ভেবেছিলাম, আপনাকে আবার ঝামেলায় ফেলা ঠিক হবে কিনা! যাইহোক, পাঠিয়ে দেব।

নবম পত্রে শঙ্খ জানতে চেয়েছিলেন, 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ' কি তুমি পড়েছিলে? পড়ে কোনো সংশোধন বা পরিমার্জনের কথা কি মনে হয়েছিল? চার দিন পরে লেখা (৪ জানুয়ারি ১৯৭৬) উত্তর:

'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ' পড়েছি বৈকি? সেরকম কোন সংশোধনের কথা আমার তো মনে হয়নি। শুধু একটা কথা, noteগুলো পাতার নীচে থাকলে সুবিধে হয়, শেষে থাকলে উল্টে দেখতে একটু অসুবিধে হয়। তবে পাদটীকা ছাপার বোধহয় অসুবিধে! আমার অনুরোধ, মূল text-এর অর্থাৎ ভূমিকা এবং অনুবাদ অংশের কোন পরিমার্জনা করতে যাবেন না। অনুষঙ্গ অংশে যদি নতুন তথ্য যোগ করতে চান সে আলাদা কথা।

দ্বাদশ চিঠিতে শঙ্খ লিখেছিলেন :

Hegemon-কে দুবার লিখেছ হোনোফেন। এইটেই কি উচ্চারণ হবে?

শিশিরের জবাব:

ওটাতো 'হেগেমোন' হওয়াই উচিত। আমার খুব বড় ভুল হয়ে গেছে। অথচ আমার কাছে যে rough draft আছে তাতে 'হেগেমোন' আছে।

"শিশিরের কথা উঠলে কলম যেন আর থামতেই চায় না।" *পুরোনো চিঠির ঝাঁপি*-তে ভ্রাতৃবন্ধু শিশিরকুমার দাশ সম্পর্কে কবি শঙ্খ ঘোষ আরও বলেছেন একইসঙ্গে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যময় ও স্বতঃস্ফূর্ত কৌতুক রঙ্গে চারপাশ মাতিয়ে রাখা মানুষ শিশির। ঝাঁপি খুলে তুলে ধরেছেন তাঁকে লেখা শিশিরকুমার দাশের অনেকগুলি চিঠি। তার কোনোটি প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসা ভরা, কোথাও-বা পারিবারিক আবহ, কোনোটি 'অকারণ পুলক'-এ উচ্ছ্বাসিত। স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন: "রবীন্দ্রনাথ একবার লিখেছিলেন 'বাজে কথাতেই মানুষ আপনাকে ধরা দেয়।' বলেছিলেন: 'কয়লা আগুন না পাইলে জ্বলে না, স্ফটিক অকারণে ঝক্‌মক্‌ করে। ... এক-একটি দুর্লভ মানুষ এইরূপ স্ফটিকের মতো ঝল্‌মল্‌ করিতে পারে।'

সেইরকম এক স্ফটিক ছিল আমাদের শিশির, শিশিরকুমার দাশ।"

শঙ্খ ঘোষকে লেখা শিশিরকুমার দাশের কিছু চিঠি পূর্বোক্ত বইটিতে অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় পাঠকের কৌতূহল বাড়ে শিশিরকুমারকে লেখা শঙ্খের চিঠিগুলি পড়ার। সেই কাজে ব্যস্ত ছিলেন গবেষক, সম্পাদক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ভূঁইয়া ইকবাল (১৯৪৬-২০২১)। কবি শঙ্খ ঘোষের স্মরণে একটি লেখা দেওয়ার কথা তাঁকে বলতেই পাঠিয়ে দেন শিশিরকে লেখা শঙ্খের পত্রাবলি বিষয়ক তাঁর প্রকাশিতব্য বইটির একটি অংশ, সঙ্গে কয়েকটি চিঠির বৈদ্যুতিন প্রতিলিপি।

অধ্যাপক ভূঁইয়া ইকবাল ১৯৪৬-এর ২২ নভেম্বর ভোলায় জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর অধ্যাপক ইকবাল ১৯৮৪-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর কর্মজীবনের সূচনা তৎকালীন 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকায়। ১৯৭৩-এ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান ও ২০১৩-য় অবসর গ্রহণ। *বাংলাদেশে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা, রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ, পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্র-বক্তৃতা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্জনতা থেকে জনারণ্যে: শামসুর রাহমান, সমাজ ও সংস্কৃতি:আনিসুজ্জামানের সম্মানে প্রবন্ধ সম্ভার, অমিয় চক্রবর্তীর স্মৃতিকথা ও পত্রাবলি প্রভৃতি* তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা-সম্পাদনা। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* সম্পাদনার জন্য পেয়েছেন বাংলাদেশ লেখক শিবিরের হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার। প্রবন্ধ গবেষণার জন্য তিনি ২০১৪-য় বাংলা একাডেমি পুরস্কারে ভূষিত হন। ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে ২২ জুলাই ২০২১ সকালে ৭৫ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রতিমা ঘোষ ও শঙ্খ ঘোষ *ছবি: দীপঙ্কর দাশ*

হাসান আজিজুল হকের সঙ্গে *ছবি: ফাহাদ কাইজার*

আয় আরো হাতে হাত রেখে

আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি

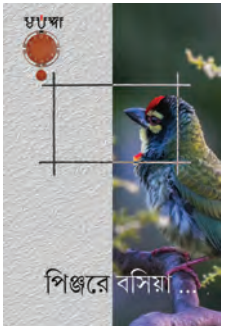

ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন

http://harappa.co.in/harappa_booklet.html